তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

ষষ্ঠ শ্রেণি

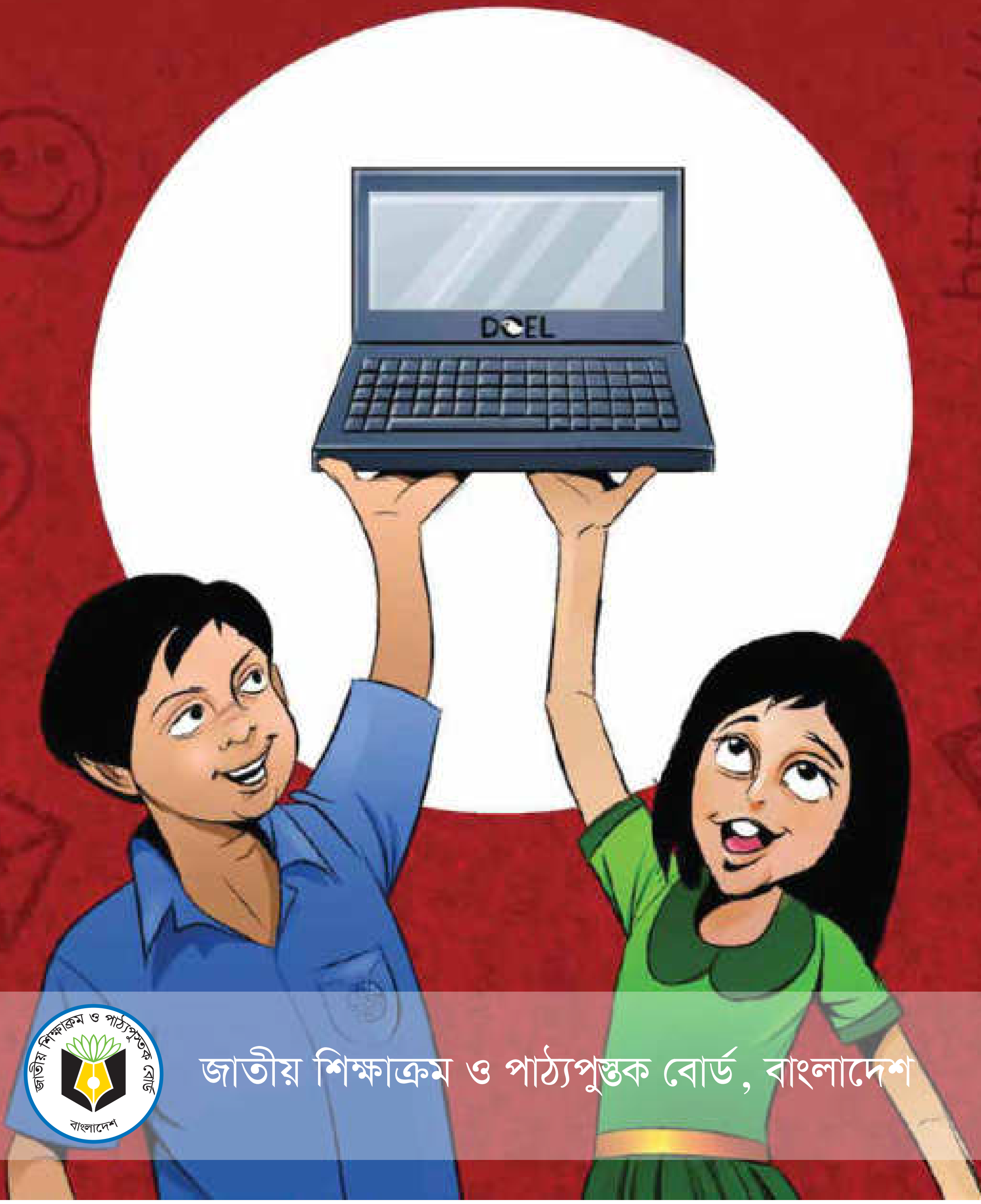

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

ষষ্ঠ শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা
ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল
মোস্তাফা জব্বার
মুনির হাসান
মোঃ আফজাল হোসেন সারওয়ার
মোঃ মোখলেস উর রহমান
ড. সুরাইয়া পারভীন
ড. আবুল কালাম মো: রফিকুল্লাহ
ফারজানা আরেফীন
শামসুজ্জাহান লুৎফা
মোঃ মুনাব্বির হোসেন
লুৎফুর রহমান

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১১
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে সাক্ষরতা অর্জনের পাশাপাশি পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষানীতিতে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি শিক্ষাব্যবস্থার সকল ধারায় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রণীত হয়েছে এ বিষয়ের শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক। আশা করি, ষষ্ঠ শ্রেণির **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি** পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে সাক্ষরতা অর্জন, এই বিষয়ে আগ্রহী এবং নতুন কাজের সুযোগ তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরিচিতি	১
দ্বিতীয়	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি	১৭
তৃতীয়	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার	৩৭
চতুর্থ	ওয়ার্ড প্রসেসিং	৪৭
পঞ্চম	ইন্টারনেট পরিচিতি	৫৭

প্রথম অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরিচিতি

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কী তা বর্ণনা করতে পারব;
- উপাত্ত আর তথ্যের মধ্যে পার্থক্য কী তা উদাহরণসহ বর্ণনা করতে পারব;
- কোথায় কোথায় তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে তা বর্ণনা করতে পারব;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নিজের স্কুলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার নিয়ে একটা পোস্টার তৈরি করতে পারব ।

পাঠ ১: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ধারণা

তথ্য ও যোগাযোগ শব্দ দুটি আমাদের খুব পরিচিত। আর প্রযুক্তির অনেক উদাহরণ আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। আমরা যখন "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি" কথাটি বলি তখন আমরা কিন্তু বিশেষ একটা বিষয় বোঝাই, সেই বিশেষ বিষয়টি বোঝার জন্যে প্রথমে কয়েকটি ঘটনার কথা কল্পনা করা যাক :

ঘটনা ১: মাসুমের বাড়ি ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায়। তার বাবা সাগরে মাছ ধরে সংসার চালান। নৌকা নিয়ে সাগরে যাওয়ার সময় তার বাবা সব সময় ছোটো একটা রেডিও সাথে নিয়ে যান। একদিন মাসুম তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "বাবা তুমি সব সময় রেডিওটি নিয়ে যাও কেন?" বাবা বললেন, "সাগরে যদি ঝড় বৃষ্টি হয়, সেই খবরটা আমি দ্রুত রেডিওতে পেয়ে যাই।"

সাগরে জেলে নৌকায় মাছ ধরছে

সুস্বাদু স্ট্রবেরি

ঘটনা ২: নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া উপজেলার কৃষক ইউনুস একদিন বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'কৃষি দিবানিশি' অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন। সেখান থেকে জানতে পারলেন, স্ট্রবেরি নামে একটা বিদেশি ফল নাকি বাংলাদেশেও চাষ করা সম্ভব। ইউনুস খুবই উৎসাহী একজন কৃষক। তিনি চার মাস খাটাখাটুনি করে তাঁর এক একর জমিতে স্ট্রবেরি চাষ করলেন। খুব ভালো ফলন হলো। এই সুস্বাদু আর পুষ্টিকর ফল বাজারে বিক্রি করলেন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায়! তাঁর নতুন একটা জীবন শুরু হলো তখন থেকে।

এসএমএস করেই এখন পরীক্ষার ফলাফল জানা যায়

ঘটনা ৩: শ্রাবণী পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা দিয়েছে। তার বাবা মা ভেবেছিলেন পরীক্ষার ফলাফল জানতে তাদের স্কুলে যেতে হবে। শ্রাবণী তার বাবা মাকে বলল যে, মোবাইল টেলিফোনের একটা বিশেষ নম্বরে তার রোল নম্বর আর বোর্ডের আইডি লিখে একটা এসএমএস পাঠালেই ফলাফল চলে আসবে। তার বাবা মা প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইলেন না, কিন্তু যখন এসএমএসটি পাঠালেন সাথে সাথে ফিরতি এসএমএসে শ্রাবণীর ফলাফল চলে এলো। সে জিপিএ ৫.০০ পেয়েছে। শ্রাবণীর খুশি দেখে কে!

ঘটনা ৪: এই বছর জাতীয় রচনা প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ"। রাশেদ ঠিক করল সে অংশগ্রহণ করবে; কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অনেক খুঁটিনাটি সে জানে না। কোথায় সে খুঁজে পাবে তা নিয়ে যখন সে চিন্তা করছে তখন তার ইন্টারনেটের কথা মনে পড়ল। একটা কম্পিউটারের সামনে বসে বাবার সহায়তায় ইন্টারনেট থেকে সে মুক্তিযুদ্ধের অনেক তথ্য সংগ্রহ করে। সেগুলো ব্যবহার করে চমৎকার একটা রচনা লিখে সে প্রতিযোগিতায় পাঠিয়ে দিল।

ইন্টারনেট ব্যবহার করে ওয়েবসাইট থেকে সহজেই তথ্য পাওয়া যায়

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে বড় পর্দায় খেলা দেখানো হচ্ছে

ঘটনা ৫: ঢাকায় তখন ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে। রিয়া আর অন্তু তাদের বাবার কাছে আবদার করল যে তারা খেলা দেখবে। বাবা অনেক চেষ্টা করেও টিকিট জোগাড় করতে পারলেন না। তখন হঠাৎ মনে পড়ল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বড়ো পর্দায় ক্রিকেট খেলা দেখানো হয়। বাবা খেলার দিন রিয়া আর অন্তুকে নিয়ে সেখানে চলে এলেন। বিশাল বড়ো পর্দায় খেলা দেখতে পেয়ে তাদের মনে হলো বুঝি মাঠে বসেই খেলা দেখছে!

তোমাদের বেশ কয়েকটা ঘটনার কথা বলা হলো। মনে হতে পারে একটা ঘটনার সাথে অন্য ঘটনার কোনো মিল নেই। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই তোমরা বুঝতে পারবে আসলে প্রত্যেকটা ঘটনার মাঝেই একটা মিল রয়েছে। প্রত্যেকটা ঘটনাতেই তথ্যের আদানপ্রদান হয়েছে। মাসুমের বাবা রেডিও থেকে ঝড় বৃষ্টির তথ্য জানতে পারছেন, ইউনুস টেলিভিশনে স্ট্রবেরি চাষের তথ্য পাচ্ছেন, শ্রাবণী মোবাইল টেলিফোনে তার পরীক্ষার ফলাফলের তথ্য পেয়ে যাচ্ছে, রাশেদ ইন্টারনেট থেকে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য পাচ্ছে আর সবশেষে রিয়া আর অন্তু বড়ো পর্দায় ক্রিকেট খেলার তথ্য পেয়ে যাচ্ছে। এই তথ্যগুলো দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই কোনো না কোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এই তথ্য দেওয়া-নেওয়া কিংবা সংরক্ষণ করার যে প্রযুক্তি সেটাই হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি।

তোমরা বুঝতেই পারছ তথ্যের দেওয়া-নেওয়ার এই ব্যাপারটি একদিনে হয়নি। এক সময় মানুষ একজনের সাথে আরেকজন কথা বলেই শুধু তথ্য বিনিময় করতে পারত। তারপর মাটি, পাথর, গাছের বাকলে লিখে তথ্য দেওয়া-নেওয়া শুরু হলো। চীনারা কাগজ আবিষ্কার করার পর হতে তথ্য দেওয়া-নেওয়ার সুযোগ অনেক বেড়ে যায়। টেলিফোন আবিষ্কার হওয়ার পর তথ্য বিনিময় একটি নতুন জগতে পা দিয়েছিল। তারবিহীন (wireless) তথ্য পাঠানো বা বেতার আবিষ্কারের পর সারা পৃথিবীটাই মানুষের হাতের মুঠোয় চলে আসতে শুরু করে।

আর এখন? সেই ইতিহাস বুঝি বলেই শেষ করা যাবে না।

কাজ

১. চার-পাঁচজনের দল তৈরি করে এই পাঠের মধ্যে নতুন নতুন কী যন্ত্রপাতির নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার তালিকা কর। দেখা যাক, কোন দল সবচেয়ে বেশি যন্ত্রের নাম লিখতে পারে।

২. কোন যন্ত্রের কাজ কী অনুমান করে খাতায় লিখ।

নতুন শিখলাম : এসএমএস, ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, বেতার।

পাঠ ২ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ধারণা

একটা সময় ছিল যখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে কেউ চিঠি লিখলে সেই চিঠি যেতে এক থেকে দুই সপ্তাহ লেগে যেত। তার কারণ চিঠিগুলো লেখা হতো কাগজে, খামের ওপর ঠিকানা লিখতে হতো এবং সেই চিঠি জাহাজ, প্লেন বা গাড়িতে করে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেত। তারপর সেগুলো আলাদা করা হতো। সবশেষে কোনো না কোনো মানুষ খামের ওপর সেই ঠিকানা দেখে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিত।

এখনো সেরকম চিঠি লেখা হয়। আপনজনের হাতে লেখা একটা চিঠির জন্যে এখনো সবাই অপেক্ষা করে থাকে। কিন্তু কাজের কথা বিনিময় করার জন্যে এখন নতুন অনেক পদ্ধতি বের হয়েছে। সেগুলো ব্যবহার করে চোখের পলকে মানুষ এক দেশ থেকে আরেক দেশে চিঠি পাঠাতে পারে। শুধু কি চিঠি? চিঠির সাথে ছবি, কথা, ভিডিও সবকিছু পাঠানো সম্ভব। বলতে পারো পুরো পৃথিবীটা একেবারে হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। একটা গ্রামে যেরকম একজন মানুষ আরেকজনের সাথে যখন খুশি যোগাযোগ করতে পারে; ঠিক সেরকম পুরো পৃথিবীটাই যেন একটা গ্রাম, সবাই সবার সাথে যোগাযোগ করতে পারে। সেটা বোঝানোর জন্যে গ্লোবাল ভিলেজ (global village) বা বৈশ্বিক গ্রাম নামে নতুন শব্দ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে। বাস্তবে পাশাপাশি না থাকলেও "কার্যত" (virtually) এখন আমরা সবাই পাশাপাশি।

এর সবই সম্ভব হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে। এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে বাস্তবে রূপদান করার জন্যে যে প্রযুক্তিটি সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে সেটি হচ্ছে ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্স। তাই আমরা অনেক সময় বলি এই যুগটাই হচ্ছে ডিজিটাল যুগ! শুধু তাই না, আমরা বলি আমাদের প্রিয় দেশটাকেই আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করে ফেলব–যার অর্থ একেবারে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের সব মানুষের জীবন সহজ করে দেবো, সবার দুঃখ দুর্দশা দূর করে জীবনকে আনন্দময় করে দেবো।

আধুনিক প্রযুক্তি গড়ে উঠেছে ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্স দিয়ে। আর এই ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্স পুরো পৃথিবীটাকে বদলে দিচ্ছে

তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছ প্রযুক্তি বলতে আমরা কী বোঝাই। বিজ্ঞানের তথ্যের ওপর নির্ভর করে তৈরি করা নানা রকম যন্ত্রপাতি আর কলাকৌশল ব্যবহার করে যখন মানুষের জীবনটাকে সহজ করে দেওয়া হয় সেটাই হচ্ছে প্রযুক্তি।

এখানে তোমাদের কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে–অনেক প্রযুক্তি মানুষের জীবন সহজ করতে গিয়ে জীবনটাকে অনেক জটিল করে দেয়। অনেক প্রযুক্তি একদিকে মানুষের জীবনকে সহজ করেছে। কিন্তু অন্যদিকে পরিবেশ নষ্ট করে বিপদ ডেকে আনছে। আবার, অনেক প্রযুক্তি আছে যেটা আমাদের প্রয়োজন নেই, তবুও আমরা সেই প্রযুক্তির জন্যে লোভ করে অশান্তি ডেকে আনি।

কাজ

ক্লাসের সব শিক্ষার্থী দুই দলে ভাগ হয়ে যাও। এক দল ভালো ভালো প্রযুক্তির কথা বল। অন্য দল বিপজ্জনক প্রযুক্তি, পরিবেশ নষ্ট করে এরকম প্রযুক্তি, আর অপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তির কথা বল।

একটা সময় ছিল যখন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করত শুধু বড় বড় দেশ কিংবা বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান। তার কারণ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্যে প্রয়োজন হতো কম্পিউটার আর সেই কম্পিউটার তৈরি করা কিংবা ব্যবহার করার ক্ষমতা সবার ছিল না। তখন একটা কম্পিউটার রাখার জন্যে রীতিমতো একটা আস্ত দালান লেগে যেত। তার কার্য ক্ষমতাও ছিল খুব কম। সেই কম্পিউটার একদিকে দেখতে দেখতে ছোট হতে শুরু করেছে; অন্যদিকে তার কার্য ক্ষমতাও বাড়তে শুরু করেছে। তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে এক সময় যে কম্পিউটার কিনতে লক্ষ লক্ষ টাকা লাগত, এখন তার থেকে শক্তিশালী কম্পিউটার তোমার পরিচিতজনের মোবাইল টেলিফোনের ভেতরে আছে।

এনিয়াক (ENIAC) নামের পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটারটি রাখার জন্যে দরকার হয়েছিল বিশাল একটি ঘরের

শিশুরা কম্পিউটার ব্যবহার করছে

কাজেই বুঝতেই পারছ, কম্পিউটার এখন মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। যে তথ্যপ্রযুক্তি একসময় ব্যবহার করত শুধু খুব বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান কিংবা অল্প কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, এখন সাধারণ মানুষও সেটা ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কম্পিউটারের পাশাপাশি নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে, কম্পিউটার আর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার জন্যে নতুন নতুন সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে, যোগাযোগ সহজ করার জন্যে অপটিক্যাল ফাইবার কিংবা উপগ্রহ ব্যবহার করা হচ্ছে, তথ্য দেওয়া-নেওয়া করার জন্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করা হচ্ছে। বাস, ট্রাক চালানোর জন্যে যে রকম রাস্তা বা হাইওয়ে তৈরি করতে হয় ঠিক সেরকম তথ্য দেওয়া নেওয়ার জন্যে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে তৈরি হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে একদিকে যেমন পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের তথ্য দেওয়া-নেওয়া সহজ হয়ে গেছে, ঠিক সেরকম পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী মানুষ যে তথ্যটি নিতে পারে, একেবারে সাধারণ একজন মানুষও ঠিক সেই তথ্যটি নিজের জন্যে নিতে পারে। কাজেই বলা যেতে পারে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সারা পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার একটা বিপ্লব শুরু হয়েছে। সেই বিপ্লব কোথায় থামবে কেউ বলতে পারে না!

তোমরা সবাই নিশ্চয়ই এতক্ষণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে আমরা কী বোঝাতে চেয়েছি তার একটা ধারণা পেয়ে গেছ। তথ্য দেওয়া-নেওয়া, বাঁচিয়ে রাখা বা সংরক্ষণ করা আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা, বিশ্লেষণ করা এবং নিজের কাজে ব্যবহার করার প্রযুক্তিই হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি!

কাজ

১. চার-পাঁচজনের দল করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্যে কী কী প্রযুক্তি বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয় তার একটা তালিকা কর।

২. এই পাঠে যেসব যন্ত্রপাতির কথা বলা হয়েছে তার কোনটি কী কাজে লাগে অনুমান করে লেখার চেষ্টা কর।

নতুন শিখলাম : গ্লোবাল ভিলেজ, ভার্চুয়াল, ডিজিটাল, ইলেকট্রনিক্স, ডিজিটাল যুগ, ডিজিটাল বাংলাদেশ, প্রযুক্তি, কম্পিউটার, সফটওয়্যার, অপটিক্যাল ফাইবার, উপগ্রহ, ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে।

২০২৫

পাঠ ৩ : উপাত্ত ও তথ্য

তোমাকে যদি বলা হয় ৯৮, ১০০, ১০০, ৯৬, ৫০ এবং ৯৫, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে এই সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকবে এবং কেন তোমাকে এই সংখ্যাগুলোর কথা বলা হয়েছে বোঝার চেষ্টা করবে। তুমি যতই চেষ্টা কর, তুমি এই সংখ্যাগুলোর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারবে না। কিন্তু তোমাকে যদি বলে দেওয়া হয় এটি হচ্ছে রিমি নামে একটা মেয়ে যে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে তার বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর— তাহলে হঠাৎ করে সংখ্যাগুলোর অর্থ তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

জ্ঞান পিরামিড (Knowledge Pyramid)

এখানে ৯৮, ১০০, ১০০, ৯৬, ৫০ এবং ৯৫ হচ্ছে উপাত্ত বা ডাটা (data)। একজনকে যদি শুধু উপাত্ত দেওয়া হয় আর কিছু বলে দেওয়া না হয়, তাহলে এই উপাত্তগুলোর কিন্তু কোনো অর্থ নেই। কিন্তু যখন সাথে সাথে তোমাকে বলে দেওয়া হয় যে এগুলো রিমি নামে একটি মেয়ের পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর, তখন তার একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। উপাত্ত আর প্রেক্ষাপট মিলে একটা তথ্য বা ইনফরমেশন (information) হয়ে যায়। তথ্যকে যদি বিশ্লেষণ করা হয় সেখান থেকে কিন্তু জ্ঞান (knowledge) বের হয়ে আসে। বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মানুষের প্রজ্ঞা (wisdom) তৈরি হয়।

> কাজ : আমরা রিমির এই তথ্য বিশ্লেষণ করে কি কোনো জ্ঞান বের করতে পারব?
>
> সাহায্য : তার প্রিয় বিষয় কী? কোন বিষয়টিতে সে দুর্বল?

আরও কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে উপাত্ত আর তথ্যটুকু বোঝার চেষ্টা করি।

আমরা যদি বলি :

হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না, হ্যাঁ, না, হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, হ্যাঁ
৮৯, ৭০, ৬৫, ৭৩, ৭৫, ৫০, ৯০, ৬৪
১৯৯৭৩০৯০৪২২১৮৩০৪৯
০৫, ১১, ২০০০

তোমরা এর কোনো অর্থই খুঁজে পাবে না। কিন্তু একটু আগে যেরকম অর্থহীন কিছু সংখ্যা দেখেছি সেগুলো আসলে কী– বলে দেওয়ার পর সেগুলো তথ্য হয়ে গিয়েছিল, এখানেও সেটি সম্ভব। তোমাকে যদি বলা হয় এই সংখ্যাগুলো একটা তালিকা থেকে নেওয়া হয়েছে এবং সেই তালিকাটি হচ্ছে এরকম :

ঘটনা বা প্রেক্ষাপট	উপাত্ত									
তোমার ক্লাসের দশজন ছাত্রছাত্রীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তোমরা কি ঘুমানোর আগে দাঁত ব্রাশ কর?	নান্টু	বিলু	রেনু	কণা	প্রীতি	জবা	মন্টু	সুমি	পিন্টু	ইতি
	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ
রিমির জন্ম নিবন্ধন নম্বর	১৯৯৭৩০৯০৪২২১৮৩০৪৯									
মন্টুর জন্ম তারিখ	দিন				মাস			বছর		
	০৫				১১			২০০০		

এবার নিশ্চয়ই ওপরের তালিকার উপাত্তগুলোর অর্থ তুমি খুঁজে পেয়েছ। কাজেই আমরা বুঝতে পারছি, উপাত্তের সাথে যদি কোনো ঘটনা বা প্রেক্ষাপট বা পরিস্থিতির সম্পর্ক থাকে তখন সেগুলোর অর্থ বোঝা যায়, আমরা সেটা ব্যবহারও করতে পারি, তখন সেটা হচ্ছে তথ্য।

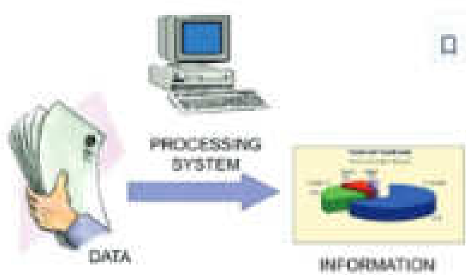

কম্পিউটার ও তথ্য বিজ্ঞান অনুসারে বলা যায় যে, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে ডেটা প্রক্রিয়াকরণের ফলে প্রাপ্ত ফলাফলকে ইনফরমেশন বা তথ্য বলা হয়। যেমন কোনো ছাত্রের বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর হল ডেটা, কিন্তু তার সকল বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর হিসাব করে তৈরি করা প্রোগ্রেস (progress) রিপোর্ট হচ্ছে ইনফরমেশন। ডেটাকে প্রসেস করেই ইনফরমেশন পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রসেসিং পরবর্তী ডেটার অর্থবহ রূপকে ইনফরমেশন বলে। ইনফরমেশন নির্ভুল, স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত, অর্থবহ ও প্রয়োজনীয় হওয়া দরকার। ডেটাকে প্রসেস করার জন্য কম্পিউটার বা অন্য কোন প্রসেসিং সিস্টেম ব্যবহৃত হতে পারে।

কাজ

১. একটা কাগজে কোনো উপাত্ত লিখে তোমার বন্ধুকে দাও। তাকে অনুমান করতে বল, এই উপাত্তগুলোর অর্থ কী! সে যদি অনুমান করতে না পারে তাহলে সে তোমাকে দশটা প্রশ্ন করতে পারবে। প্রশ্নগুলো এমন হতে হবে যেটা তুমি উত্তর দেবে শুধু "হ্যাঁ" কিংবা "না" বলে।

২. তোমার নিজের সম্পর্কে সকল তথ্যের একটা তালিকা কর।

নতুন শিখলাম : তথ্য, উপাত্ত, জ্ঞান।

পাঠ ৪ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

তোমরা যদি আগের দুটো পাঠ মন দিয়ে পড়ে থাক তাহলে নিশ্চয়ই এতক্ষণে জেনে গেছ যে, আমরা খুব সৌভাগ্যবান। কারণ ঠিক এই সময়টাতে সারা পৃথিবীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে একটা অসাধারণ বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে। আমরা সেই বিপ্লবটাকে ঘটতে দেখছি। সবকিছু পাল্টে যাচ্ছে– আমরা ইচ্ছে করলে সেই নতুন জীবনে বসবাস করতে পারি কিংবা আমরা নিজেরাই পৃথিবীটাকে পাল্টে দেওয়ার কাজে লেগে যেতে পারি। সেটা করতে হলে আমাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিষয়টা সম্পর্কে জানতে হবে, কীভাবে সেটা আমাদের জীবনটাকে পাল্টে দিচ্ছে বুঝতে হবে এবং যখন তোমরা বড়ো হবে তখন বিজ্ঞানী কিংবা প্রযুক্তিবিদ হবে, নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে আমাদের দেশ এবং পৃথিবীকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জগতে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ে লেখাপড়া করে তুমিও একদিন পৃথিবীটা বদলে দেওয়ার কাজে অংশ নিতে পারবে।

এবার একটি খুব সহজ প্রশ্ন করা যাক। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই উন্নতির কারণে আমাদের জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে? তোমরা নিশ্চয়ই অনেক চিন্তাভাবনা করে সেই ক্ষেত্রগুলো বের করার চেষ্টা করছ। কেউ নিশ্চয়ই বলবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, কেউ বলবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে আবার কেউ বলবে বিনোদনের ক্ষেত্রে। কিন্তু সত্যিকারের উত্তরটি কী? সত্যিকারের উত্তর হচ্ছে তথ্য ও প্রযুক্তির এই উন্নতির কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে সেটি কেউ বলে শেষ করতে পারবে না। তোমার পরিচিত অপরিচিত জানা অজানা সবক্ষেত্রে এটি বিশাল পরিবর্তন করে ফেলতে পারবে। তাহলে তুমি বলে শেষ করবে কেমন করে? সত্যি কথা বলতে কী পরিবর্তনের ক্ষেত্রগুলো কী কী সেটা নির্ভর করবে মানুষের সৃজনশীলতার ওপর। যে মানুষ যত সৃজনশীল সে তত বেশি ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করতে পারবে।

তার কারণটি কী জান? তার কারণ হচ্ছে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিয়ে আমরা কেবল তথ্যের আদান-প্রদান করি না। আমরা তথ্যগুলো বিশ্লেষণ বা প্রক্রিয়াও করি আর সেই কাজ করার জন্যে কম্পিউটার ব্যবহার করতে হয়। কম্পিউটার একটি অসাধারণ যন্ত্র, সেটা দিয়ে সম্ভব-অসম্ভব সব কাজ করে ফেলা যায়।

একসময় কম্পিউটার বলতেই সবার চোখের সামনে টেলিভিশনের মতো একটা বড়ো মনিটর, বাক্সের মতো সিপিইউ আর কি-বোর্ডের ছবি ভেসে উঠত। এখন সেটা ছোটো হয়ে ল্যাপটপ হয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, কম্পিউটার আরও ছোটো হয়ে নোটবুক, ট্যাবলেট বা স্মার্টফোন পর্যন্ত হয়ে গেছে, আমরা এখন সেগুলো পকেটে নিয়ে ঘুরতে পারি!

সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে যে, কম্পিউটার এখন এত ছোটো করে তৈরি করা সম্ভব যে, আমাদের মোবাইল ফোনের ভেতরেও সেটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই আগে আমরা যে কাজগুলো শুধুমাত্র কম্পিউটার দিয়ে করতে পারতাম সেগুলো আমরা এখন মোবাইল টেলিফোন দিয়েও করতে পারি! এমনকি আমরা মোবাইল টেলিফোন দিয়ে ইন্টারনেটে পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে পারি।

এবার আমরা আগের বিষয়টিতে ফিরে যাই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে পারি? এবার আমরা পরিবর্তিত ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে জানব :

ব্যক্তিগতভাবে বা সামাজিকভাবে যোগাযোগ : শুধু মোবাইল ফোন দিয়েই আমরা আজকাল একে অন্যের সাথে অনেক বেশি যোগাযোগ করতে পারি। তার সাথে এসএমএস, ই-মেইল, চ্যাটিং এমনকি সামাজিক যোগাযোগ যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাব যোগাযোগের বেলায় একটা অনেক বড়ো পরিবর্তন এসেছে। সবটুকুই যে ভালো তা কিন্তু নয়—নতুন প্রজন্মের কেউ কেউ এই ব্যাপারে বেশি সময় নষ্ট করছে, কেউ কেউ মনে করছে এই যোগাযোগটি বুঝি সত্যিকারের সামাজিক যোগাযোগ। কাজেই এগুলোতে বেশি নির্ভরশীল হয়ে কেউ কেউ খানিকটা অসামাজিকও হয়ে যেতে পারে।

আজকাল খুব সাধারণ মোবাইল টেলিফোন দিয়ে ইন্টারনেট পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়

বিনোদন : এখন বিনোদনও অনেকখানি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে। বই পড়া, গান শোনা, সিনেমা দেখা থেকে শুরু করে কম্পিউটার গেম খেলায় পর্যন্ত এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। ক্রিকেট বা ফুটবল খেলাতে এই প্রযুক্তি কত চমৎকারভাবে ব্যবহার করা হয় আমরা সবাই সেটি দেখেছি। খেলার মাঠে না গিয়েও ঘরে বসে আমরা অনেক বড়ো বড়ো খেলা খুব নিখুঁতভাবে দেখতে পারি।

বিনোদনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করার বিষয়ে আমাদের একটু সতর্ক থাকার ব্যাপার আছে। একটি ছোটো শিশুর শরীরটাকে ঠিকভাবে গঠন করার জন্যে মাঠে ছোটাছুটি করে খেলতে হয়। অনেক জায়গাতেই দেখা যায়, বাবা মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের মাঠে ছোটাছুটি না করিয়ে ঘরে কম্পিউটারের সামনে দীর্ঘ সময় বিনোদনে ডুবে থাকতে দিচ্ছেন! সত্যিকারের খেলাধুলা না করে শিশুরা কম্পিউটারের খেলায় মেতে উঠছে। একটা শিশুর মানসিক গঠনের জন্যে সেটা কিন্তু মোটেও ভালো নয়। সারা পৃথিবীতেই কিন্তু এই সমস্যাটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

কম্পিউটার গেম নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের খুব প্রিয় একটি বিষয়, কিন্তু সেটি হতে হবে পরিমিত এবং নিয়ন্ত্রিত

কাজ

কম্পিউটার গেম খেলার পক্ষে পাঁচটি এবং বিপক্ষে পাঁচটি যুক্তি লিখ।

নতুন শিখলাম : ল্যাপটপ, নোটবুক, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন, ই-মেইল, চ্যাটিং।

পাঠ ৫ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

আগের পাঠে আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটির (Information and Communication Technology-ICT) এমন দুটি উদাহরণ দিয়েছি যেগুলো আমরা সবাই জেনে হোক না জেনে হোক কোনো না কোনোভাবে ব্যবহার করেছি। এই পাঠে আমরা আরও নতুন কিছু ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জানব।

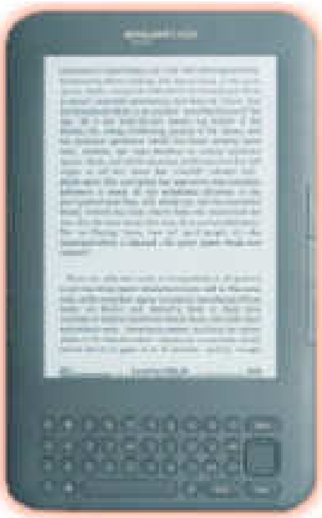

একটা ই-বুক ডিভাইসে কয়েক হাজার বই রাখা যায়

শিক্ষাক্ষেত্র: একজন শিক্ষার্থীর কাছে সবচেয়ে আনন্দের ধ্বনি কী বলতে পারবে? অনেকেই অনেক কিছুই বলতে পারে কিন্তু সবাই জানে স্কুলের শিক্ষার্থীর জন্যে সেটা হচ্ছে ছুটির ঘণ্টা। স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বাজলে পৃথিবীর সকল স্কুলের শিক্ষার্থীরা আনন্দ প্রকাশ করে। যাঁরা শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করে ভাবনা করেন তাঁরাও সেটা জানেন। তাই সব সময় চেষ্টা করেন কীভাবে একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনটা একটু হলেও বেশি আনন্দময় করা যায়। লেখাপড়ার ব্যাপারে যখন আইসিটি ব্যবহার করতে শুরু করা হয়েছে তখন হঠাৎ করে সেই কাজটি সহজ হতে শুরু করেছে। এখন শুধু সারাক্ষণ শিক্ষকের বক্তৃতা শুনতে হবে না, মাথা গুঁজে কোনো কিছু মুখস্থ করতে হবে না। এখন মাল্টিমিডিয়াতে লেখাপড়ার অসংখ্য চমকপ্রদ বিষয় দেখানো যায়, বিজ্ঞানের বিষয়গুলো স্ক্রিনে প্রদর্শন করা যায়, এমনকি পরীক্ষার খাতায় কিছু না লিখে সরাসরি কম্পিউটারে পরীক্ষা দেওয়া যায়। এখন ব্যাগ বোঝাই করে পাঠ্য বই নিয়ে যেতে হয়। কিছুদিন পর আর তার হয়ত প্রয়োজন হবে না। একটা ই-বুক ডিভাইসে (যার মাধ্যমে কোনো পুস্তকের সফটকপি পড়া হয়) শিক্ষার্থীরা শুধু যে তার পাঠ্য বই রাখতে পারবে তা নয়; লাইব্রেরির কয়েক হাজার বই পর্যন্ত রাখতে পারবে।

চিকিৎসা: আজকাল আইসিটি ব্যবহার না করে চিকিৎসার কথা কল্পনাও করা যায় না। আগে কারও অসুখ হলে ডাক্তাররা রোগীর নানা ধরনের উপসর্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে রোগ নির্ণয় করতেন। এখন আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়। শুধু তাই নয়, কেউ যদি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যায়, তখন তার সব ধরনের তথ্য সংরক্ষণ থেকে শুরু করে তার চিকিৎসার বিভিন্ন খুঁটিনাটি আইসিটি ব্যবহার করে সংরক্ষণ করা সম্ভব। দূর থেকে টেলিফোন ব্যবহার করেও স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া যায়। সেটার নাম দেওয়া হয়েছে টেলিমেডিসিন, যেটা আমাদের দেশেও শুরু হয়েছে।

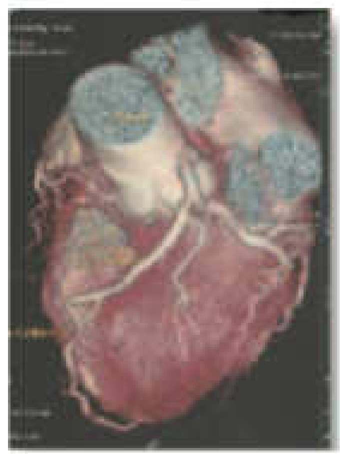

শরীরের বাইরে থেকে শরীরের ভেতরের হৃৎপিণ্ডের এরকম নিখুঁত ছবি তোলা সম্ভব

বিজ্ঞান ও গবেষণা: সম্ভবত আইসিটির সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় বিজ্ঞানে ও গবেষণায়। আইসিটির কারণে এখন বিজ্ঞানীরা গবেষণার অনেক জটিল কাজ অনেক সহজে করে ফেলতে পারেন। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরাও যখন পাটের জিনোম বের করেছিলেন তখন তাঁরা আইসিটির ব্যবহার করেছিলেন।

আমাদের দেশের বিজ্ঞানী যাঁরা পাটের জিনোম বের করতে আইসিটি ব্যবহার করেছেন

কৃষি: আমাদের দেশ হচ্ছে একটি কৃষিনির্ভর দেশ, আধুনিক উপায়ে চাষ করে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আইসিটি ব্যবহারের ফলে আমাদের দেশের চাষিরা কৃষিতে সুফল পাচ্ছে। রেডিও টেলিভিশনে কৃষি নিয়ে অনুষ্ঠান হচ্ছে, ইন্টারনেটে কৃষির ওপর ওয়েবসাইট তৈরি হয়েছে, এমনকি চাষিরা মোবাইল ফোনে কৃষি কল সেন্টারে ফোন করেও কৃষি সমস্যার সমাধান পেয়ে যাচ্ছে।

ইন্টারনেট ব্যবহার করে কৃষি নিয়ে সমস্যার সমাধান পেয়ে যাচ্ছে চাষিরা

কাজ

১. এই পাঠে যে বিষয়গুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে যে কয়টি তুমি কোনো না কোনোভাবে ব্যবহার করেছ তার একটি তালিকা তৈরি কর।

২. শিক্ষার আর কোন কোন ক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহার করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পরিবেশ আর আবহাওয়া: আমাদের দেশে এক সময় ঘূর্ণিঝড়ে অনেক মানুষ মারা যেত। ১৯৭০ সালে প্রলয়ংকরী একটা ঘূর্ণিঝড়ে এই দেশে প্রায় ৫ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। বাংলাদেশে এখন ঘূর্ণিঝড়ে আগের মতো এতবেশি মানুষ মারা যায় না; তার কারণ আইসিটি ব্যবহার করে অনেক আগেই ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। আবার রেডিও টেলিভিশনে উপকূলের মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া যায়।

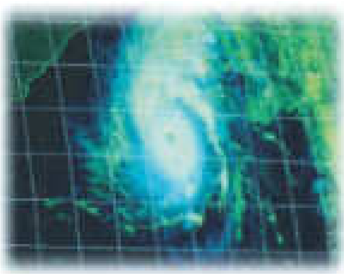

উপগ্রহ থেকে পাওয়া ঘূর্ণিঝড়ের ছবি

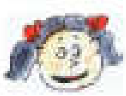

নতুন শিখলাম : ই-বুক, টেলিমেডিসিন, জিনোম, গবেষণা।

পাঠ ৬ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

আইসিটির ব্যবহারের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। তোমাদের পারিবারিক জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে এ রকম আরও কয়েকটি ব্যাপার সম্পর্কে বলা যাক।

প্রচার ও গণমাধ্যম: রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ বা অনলাইন সংবাদ মাধ্যমকে আমরা বলি প্রচার ও গণমাধ্যম। এই বিষয়গুলো আজকাল অনেক উন্নত হয়েছে। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের যেকোনো খবর শুধু যে মুহূর্তের মধ্যে আমরা পেয়ে যাই তা নয়–তার ভিডিওটিও দেখতে পাই। এই ব্যাপারগুলো সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র আইসিটির কারণে।

নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস ২০১৬ সালে ব্রাজিলের রিওডিজেনিরোতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমসের মশাল বহন করেন, যা সারা বিশ্বে দেখানো হয়েছিল

প্রকাশনা: আমাদের দেশের স্কুলের ছেলেমেয়েদের সরকার থেকে প্রতিবছর নতুন বই দেওয়া হয়। এই নতুন বইয়ের সংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি। এই বিশাল সংখ্যক বই ছাপানো সম্ভব হয় শুধুমাত্র আইসিটির কল্যাণে। আইসিটি ব্যবহার করে শুধু যে নির্ভুল আর আকর্ষণীয় করে বই ছাপানো যায় তাই নয়, বইগুলো ওয়েবসাইটে রেখেও দেওয়া যায়; যেন যে কেউ সেগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারে। যেমন- এনসিটিবির ওয়েবসাইট (www.nctb.gob.bd) থেকে সকল পাঠ্যপুস্তকের সফটকপি বা ই-বুক ভার্সন পাওয়া যায়।

এটিএম কার্ডে টাকা তোলা

ব্যাংক: একটা সময় ছিল যখন একজন মানুষকে টাকা তুলতে তার ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখায়ই যেতে হতো। এখন আর সেটি করতে হয় না। যে সব ব্যাংক অনলাইন হয়ে গেছে সে সকল ব্যাংকের হিসাবধারী (একাউন্ট হোল্ডার) যে কোনো শাখায় অর্থ জমা ও উত্তোলনের সুবিধা পেয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, যেখানে এটিএম (Automated Teller Machine) আছে সেখান থেকে ব্যাংক কার্ড দিয়ে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টার যেকোনো সময় টাকা তোলা যায়। ব্যাপারটি আরও সহজ করার জন্যে আজকাল মোবাইল টেলিফোন ব্যবহার করে ব্যাংকিং শুরু হয়ে গেছে।

শিল্প ও সংস্কৃতি: শিল্প ও সংস্কৃতিতেও আজকাল আইসিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। একসময় এক সেকেন্ডের কার্টুন ছবি তৈরি করার জন্য ২৬টি ছবি তৈরি করতে হতো। আইসিটি ব্যবহার করে সেই পরিশ্রম অনেকাংশে কমে গেছে। শুধু তাই নয়, অনেক সময় এনিমেশন ছবি এমনভাবে তৈরি হয় যে সেগুলোকে সত্যি বলে মনে হয়।

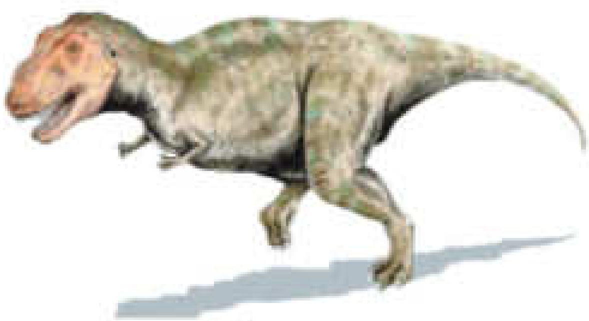

ডায়নোসর টি-রেক্স, এনিমেশন ব্যবহার করে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এই প্রাণীগুলোকে সত্যি বলে তৈরি করে ফেলা যায়

দৈনন্দিন জীবনে আইসিটি:

তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে ছাপ ফেলেছে আইসিটির এরকম কয়েকটি ব্যবহারের কথা বলা হলো; কিন্তু তোমাদের কেউ যেন মনে না করে এর বাইরে বুঝি কিছু নেই। এর বাইরেও আরও অসংখ্য বিষয় রয়েছে। তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে সরাসরি ব্যবহার না হলেও দেশের নানা কাজে কিন্তু আইসিটির ব্যবহার হয়ে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যে আইসিটির ব্যবহার হয়। সাধারণত দোকানপাটে যেরকম বেচাকেনা হয়–ইন্টারনেট ব্যবহার করেও সেরকম বেচাকেনা হয় বলে ই-কমার্স নামে একটা নতুন শব্দই তৈরি করা হয়েছে। অতীতে অফিসের কাজে অনেক সময় ব্যয় হতো। এখন আইসিটি ব্যবহার করে অফিসের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সাধারণত সেটাকে বলে ই-গভর্নেন্স। পুলিশ বাহিনী অপরাধী ধরার জন্য ব্যাপকভাবে আইসিটি ব্যবহার করে। দেশের প্রতিরক্ষার কাজে সেনাবাহিনীও আইসিটি ব্যবহার করে। কলকারখানা, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এই বিষয়গুলোও আইসিটির ব্যবহার ছাড়া রাতারাতি অচল হয়ে যাবে।

ক্লোজ সার্কিট টিভি বা সিসিটিভি ব্যবহার করে যেকোনো এলাকাকে এখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মনিটর করা যায়

কাজ

১. এখানে বলা হয়নি সেরকম আর কী কী কাজ আইসিটি ব্যবহার করে করা যায় তার একটা তালিকা তৈরি কর।

নতুন শিখলাম : অনলাইন সংবাদমাধ্যম, অনলাইন ব্যাংক, এটিএম, এনিমেশন, ই-কমার্স, ই-গভর্নেন্স।

২০১৫

পাঠ ৭ ও ৮: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব

আগের পাঠগুলোতে আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যায়, তার অনেকগুলো উদাহরণ দিয়েছি। শুধু তাই নয়, তোমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই উদাহরণগুলোই কিন্তু সব উদাহরণ নয়। এগুলো ছাড়াও আরও অনেক উদাহরণ আছে যার কথা বলা হয়নি।

এই পাঠে তোমাদের সাথে ভিন্ন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে, সেটি হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব। আগের পাঠগুলো যারা মন দিয়ে পড়েছে তারা নিশ্চয়ই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্বের ব্যাপারটা নিজেরাই অনুমান করে ফেলছে। যে প্রযুক্তির এতগুলো ব্যবহার রয়েছে সেটা যদি গুরুত্বপূর্ণ না হয় তাহলে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ হবে? শুধু যে অনেকগুলো ব্যবহার রয়েছে তা নয়, প্রত্যেকটা ব্যবহারের বেলাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কিন্তু পুরো ক্ষেত্রটাকেই সম্পূর্ণ নতুন একটা রূপ দিয়ে ফেলতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি পৃথিবীটা এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, আমরা যদি আমাদের জীবনের কাজকর্মগুলো তথ্য আর যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে না করি, তাহলে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়ব।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা আমাদের জীবনটাকে অনেক সহজ করে ফেলতে পারি। আগে যে কাজ করতে দিনের পর দিন লেগে যেত, যে কাজগুলো ছিল নিরস, আনন্দহীন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সে কাজগুলো আমরা চোখের পলকে করে ফেলতে পারি। বাড়তি সময়টুকু আমরা আনন্দে কাটাতে পারি। তাই এই যুগের মানুষ অনেক বেশি কর্মদক্ষ, অনেক কম সময়ে তারা অনেক বেশি কাজ করে ফেলতে পারে।

কাজ
ছবি দুটোতে কী ঘটছে ব্যাখ্যা কর।

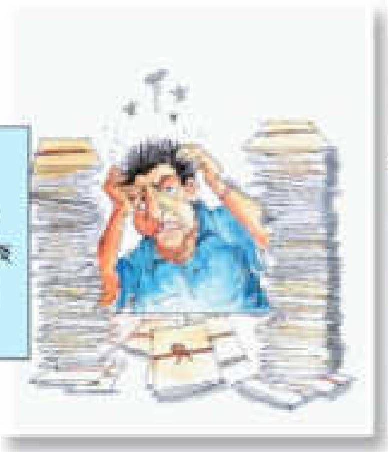

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা যে শুধুমাত্র আমাদের নিজের জীবনটাকে সহজ করতে পারি তা নয়, আমরা কিন্তু আমাদের দেশটাকেও পাল্টে ফেলতে পারি। একসময় মনে করা হতো তেলের খনি, লোহার খনি বা সোনা রুপার খনি কিংবা বড়ো বড়ো কলকারখানা হচ্ছে পৃথিবীর সম্পদ। তাই যে দেশে এগুলো বেশি তারা হচ্ছে সম্পদশালী দেশ। এখন কিন্তু এই ধারণাটা পুরোপুরি পাল্টে গেছে। এখন মনে করা হয় জ্ঞান হচ্ছে পৃথিবীর সম্পদ, আর যে দেশের মানুষজন লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত, যারা জ্ঞানচর্চা করে সেই দেশ হচ্ছে সম্পদশালী দেশ। তথ্যের চর্চা আর বিশ্লেষণ থেকে জ্ঞান জন্ম নেয়। তাই যে দেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্যকে সংগ্রহ করতে পারে, বিশ্লেষণ করতে পারে সেই দেশ হচ্ছে পৃথিবীর সম্পদশালী দেশ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শেখার দরজা সবার জন্য খোলা, তাই আমরা যত তাড়াতাড়ি এই প্রযুক্তি শিখে নিতে পারব, তত তাড়াতাড়ি আমরা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে পারব এবং দেশকে সম্পদশালী করে গড়ে তুলতে পারব।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার:

মোবাইল ফোনে যোগাযোগ

ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা

ব্যক্তিগত কম্পিউটারে কাজকর্ম

টেলিভিশনে দেশ-বিদেশের খবর দেখা

এটিএম থেকে টাকা তোলা

ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করে কাপড় ধোয়া

মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে রান্না

ই-বুক ব্যবহার করে বই পড়া

কাজ

চার-পাঁচজনের দল করে তোমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও আকর্ষণীয় করার ক্ষেত্রগুলো খুঁজে বের কর। এই ক্ষেত্রগুলোতে আইসিটি কেমন করে ব্যবহার করা যায় সেটা ব্যাখ্যা করে একটা পোস্টার তৈরি কর।

*একটি শ্রেণি কার্যক্রমে পোস্টারটি তৈরি করতে হবে। (পাঠ-৮)

পিটিস্ক্যান করে রোগ নির্ণয়

জিপিএস ব্যবহার করে গাড়ি চালানো

নতুন শিখলাম : জিপিএস, মাইক্রোওয়েভ, ওয়াশিং মেশিন।

নমুনা প্রশ্ন

১. কোন আবিষ্কারের ফলে তথ্য বিনিময় একটি নতুন জগতে পা দিয়েছিল?
ক. কম্পিউটার খ. ল্যান্ডফোন
গ. মোবাইল ফোন ঘ. অপটিক্যাল ফাইবার

২. কোনটির কারণে পৃথিবী বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত হয়েছে?
ক. কম্পিউটার খ. ইন্টারনেট
গ. ল্যান্ডফোন ঘ. মোবাইল ফোন

৩. এটিএম (ATM) কার্ড-এর ব্যবহারের ক্ষেত্র কোনটি—
ক. প্রচার ও গণমাধ্যম খ. প্রকাশনা
গ. বিনোদন ঘ. ব্যাংকিং

৪. যোগাযোগ সহজ করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে-
ক. ডিজিটাল ক্যামেরা খ. সিসি টিভি
গ. অপটিক্যাল ফাইবার ঘ. অনলাইন সংবাদ মাধ্যম

৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হলো–
i নতুন নতুন হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার উদ্ভাবন
ii পৃথিবীর যেকোনো স্থানে তথ্য পাওয়ার সুবিধা
iii তথ্য বিনিময়ের অবারিত সুযোগ

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

ভালো ফলাফলের জন্য একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক ফারজানাকে মাসিক ১০০০.০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করে। বৃত্তির টাকা উঠানোর জন্য ফারজানাকে ঐ ব্যাংকে হিসাব খুলতে হয়। হিসাব খোলার সময় আবেদনপত্রে নাম, জন্ম তারিখ, পিতা ও মাতার নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষর ইত্যাদি পূরণ করতে হয়।

৬. ফারজানার হিসাব খোলার সময় আবেদনপত্রে নাম, জন্ম তারিখ, পিতা ও মাতার নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষর ইত্যাদিকে কী বলা হয়?
ক. তথ্য খ. ঘটনা
গ. উপাত্ত ঘ. প্রেক্ষাপট

৭. ব্যাংক থেকে দ্রুত টাকা তুলতে ফারজানা কোনটি ব্যবহার করবে?
ক. পে-অর্ডার খ. চেক
গ. ব্যাংক ড্রাফট ঘ. এটিএম কার্ড

৮. আমাদের দেশের কৃষকরা তাদের সমস্যা সমাধানে তুলনামূলকভাবে বেশি সহায়তা পেতে পারে কোন প্রযুক্তিতে?
ক. রেডিও খ. মোবাইল
গ. ল্যান্ডফোন ঘ. টেলিভিশন

৯. ৮ নম্বর প্রশ্নের যে উত্তরটি তুমি পছন্দ করেছ সে উত্তরটি পছন্দ করার কারণ যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

....

....

....

দ্বিতীয় অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- কম্পিউটার কেমন করে কাজ করে তা বর্ণনা করতে পারব;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় সেগুলো বর্ণনা করতে পারব;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে যেসব যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যার কী তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি কম্পিউটার

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সারা পৃথিবীতে যে বিশাল পরিবর্তন শুরু হয়েছে তার পেছনে যে যন্ত্রটি সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রেখেছে সেটি হচ্ছে কম্পিউটার। আমরা আগেই বলেছি, কম্পিউটার বললেই একসময় আমাদের সামনে টেলিভিশন স্ক্রিনের মতো একটা মনিটর, কী-বোর্ড আর বাক্সের মতো একটা সিপিইউ এর ছবি ভেসে ওঠে। কারণ আমরা সবাই সেটা দেখে সবচেয়ে বেশি অভ্যস্ত। আজকাল কম্পিউটার বললেই বড়ো একটা খোলা বইয়ের মতো ল্যাপটপের ছবি ভেসে ওঠে; কিন্তু এ ছাড়াও আরও অনেক রকম কম্পিউটার আছে ছবিতে যা দেখানো হলো:

সুপার কম্পিউটার

মিনি কম্পিউটার

ডেস্কটপ

ল্যাপটপ

ট্যাবলেট পিসি

স্মার্টফোন

কম্পিউটার যন্ত্রটি কেন সারা পৃথিবীতে এত বড়ো পরিবর্তন আনতে পারে আমরা ইতোমধ্যে সেটা তোমাদের বলেছি। যন্ত্রপাতিগুলো তৈরি করা হয় একটা নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য। স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে শুধু স্ক্রু খোলা যায়। গাড়ি দিয়ে মানুষ যাতায়াত করে। আমরা গাড়ি দিয়ে স্ক্রু খুলতে পারব না কিংবা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে মানুষ যাতায়াত করতে পারবে না। কিন্তু কম্পিউটার অন্য রকম যন্ত্র, সেটা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য কাজ করা যায়। কম্পিউটার দিয়ে একদিকে যেরকম জটিল হিসাব নিকাশ করা যায়, অন্যদিকে সেটা ব্যবহার করে ছবিও আঁকা যায়। কাজেই অনেক কাজ করার উপযোগী একটা যন্ত্র যে পৃথিবীতে বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলতে পারে তাতে অবাক হওয়ার কী আছে?

তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জানতে চাও কম্পিউটার কেমন করে কাজ করে। তোমাদের অনেকের হয়ত মনে হতে পারে যে, কম্পিউটারের কাজ করার পদ্ধতিটা খুবই জটিল। কিন্তু আসলে সেটি সত্যি নয়। কম্পিউটারের কাজ করার মূল পদ্ধতিটা খুবই সোজা। নিচে তোমাদের একটা কম্পিউটারের কাজ করার ছবি দেখানো হলো:

ছবিটিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর পাঁচটি মূল অংশ রয়েছে। যথা-ইনপুট ইউনিট, আউটপুট ইউনিট, মেমরি, প্রসেসর ও কন্ট্রোল ইউনিট। যখন ইনপুট ইউনিট দিয়ে কম্পিউটারের ভেতরে উপাত্ত বা ডেটা দাও, তখন কম্পিউটারের মেমরিতে সেগুলো জমা রাখা হয়। প্রসেসর মেমরি থেকে উপাত্ত নিয়ে সেগুলো প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণ করে ফলাফল মেমরিতে জমা রাখে। কাজ শেষ হলে আউটপুট ইউনিট দিয়ে তোমাকে তথ্য বা ইনফরমেশন ফিরিয়ে দেয় এবং কন্ট্রোল ইউনিট পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করে।

তোমরা যারা কম্পিউটার দেখেছ বা ব্যবহার করেছ তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কম্পিউটারের কী-বোর্ড কিংবা মাউস হচ্ছে ইনপুট দেওয়ার মাধ্যম, এটা দিয়ে আমরা কম্পিউটারের ভেতরে উপাত্ত পাঠাই। কম্পিউটার কাজ শেষ হলে তার ফলাফলগুলো মনিটরে দেখায় কিংবা প্রিন্টারে প্রিন্ট করে দেয়। কাজেই এগুলো হচ্ছে আউটপুট পাঠানোর মাধ্যম। কম্পিউটারের মেমোরি কিংবা প্রসেসর আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই না, সেগুলো ভেতরে থাকে।

আমরা ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইস হিসেবে এখানে কী-বোর্ড, মাউস, মনিটর এবং প্রিন্টারের কথা বলেছি। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এগুলো ছাড়াও আরও অনেক ধরনের যন্ত্রপাতি থাকতে পারে, পরের পাঠগুলোতে আমরা সেই বিষয়গুলোর কথা বলব।

যে কোনো কম্পিউটারকে সচল করতে হার্ডওয়্যারের পাশাপাশি সফটওয়্যারের দরকার হয়।

কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে সেটা আমরা বলেছি। কিন্তু কীভাবে একই কম্পিউটার কখনো ছবি আঁকার কাজে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো গান শোনার কাজে ব্যবহৃত হয়, কিংবা কখনো জটিল হিসাবনিকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, সেটি এখনো বলিনি। সেই বিষয়টির কথা যদি না জানো, তাহলে কম্পিউটার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

একটু আগে আমরা ইনপুট, আউটপুট, মেমোরি আর প্রসেসরের কথা বলেছি, সেগুলো হচ্ছে কোনো না কোনো যন্ত্রপাতি। কম্পিউটারের যন্ত্রপাতির এই অংশগুলোকে বলে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার। কম্পিউটার দিয়ে কাজ করার সময় তার মেমোরিতে নির্দিষ্ট ধরনের উপাত্ত রাখতে হয়, সেগুলো প্রসেসরে গিয়ে প্রসেসরকে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করাতে পারে সেইগুলোকে বলে সফটওয়্যার। তাই যখন একটা কম্পিউটার দিয়ে জটিল হিসাবনিকাশ করা হয়, তখন হিসাবনিকাশ করার সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হয়, আবার যখন ছবি আঁকতে হয় তখন ছবি আঁকার সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হয়। মানুষের বুদ্ধিমত্তা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী সুপার কম্পিউটার থেকেও বেশি ক্ষমতাশালী। তাই কখনোই একজন মানুষের মস্তিষ্ককে কম্পিউটারের সাথে তুলনা করা ঠিক নয়–তারপরও হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের উদাহরণ দেওয়ার জন্যে সহজ করে এভাবে বলা যায়–একটা শিশু যখন জন্ম নেয় তখন সে নিজে থেকে কিছুই করতে পারে না; তার কারণ তার মস্তিষ্কটাকে বলা যায় সফটওয়্যারবিহীন হার্ডওয়্যার। শিশুটি যখন তোমাদের বয়সী হয় তখন সে তোমাদের মতো অনেক কাজ করতে পারে– বলা যেতে পারে তার হার্ডওয়্যারে অনেকগুলো সফটওয়্যার এখন ঢোকানো হয়েছে-তাই সে সেই কাজগুলো করতে পারছে।

আবার তোমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মানুষের মস্তিষ্ককে কম্পিউটারের সাথে তুলনা করা হলে মস্তিষ্ককে অপমান করা হয়। মানুষের মস্তিষ্ক কিন্তু পৃথিবীর চমকপ্রদ এবং অসাধারণ একটি বিষয়।

কাজ
১. তোমরা চারজন করে একটি দল তৈরি কর : একজন ইনপুট ডিভাইসের দায়িত্ব পালন করবে একজন আউটপুট ডিভাইসের দায়িত্ব পালন করবে। অন্য দুজনের একজন হবে মেমোরি, অন্যজন হবে প্রসেসর। তোমাদের শিক্ষক দুটি সংখ্যা লিখে ইনপুট ডিভাইসকে দেবেন। সে মেমোরিকে সেটি জানাবে। প্রসেসর মেমোরি থেকে সেটি জেনে নিয়ে সংখ্যা দুটো যোগ করে আবার মেমোরিকে বলবে। আউটপুট ডিভাইস মেমোরি থেকে সেটি জেনে নিয়ে শিক্ষককে ফেরত দেবে।
বিভিন্ন দল একই সাথে শুরু করে দেখো কারা দ্রুত করতে পারে।

নতুন শিখলাম : সুপার কম্পিউটার, মেইনফ্রেম, ট্যাবলেট পিসি, হার্ডওয়্যার।

পাঠ ২: কম্পিউটার কম্পিউটার খেলা

এই পাঠে শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার হিসেবে কাজ করবে। প্রথমে একটি কাগজে নিচের সফটওয়্যারটি লিখবে :

ছেলেমেয়েরা কম্পিউটার কম্পিউটার খেলার জন্য প্রস্তুত

১. প্রথম সংখ্যাটি ইনপুট থেকে মেমোরিতে গ্রহণ কর।
২. মেমোরির সংখ্যাটি প্রসেসরকে দাও-তার সাথে ১০ যোগ করার জন্য।
৩. যোগফলটি প্রসেসর থেকে মেমোরিতে গ্রহণ কর।
৪. মেমোরির থেকে যোগফলটি প্রসেসরকে দাও-২ দিয়ে গুণ করার জন্য।
৫. গুণফলটি প্রসেসর থেকে মেমোরিতে গ্রহণ কর।
৬. গুণফলটি মেমোরি থেকে প্রসেসরকে দাও সেখান থেকে প্রথম সংখ্যাটি বিয়োগ করার জন্য।
৭. বিয়োগফল প্রসেসর থেকে মেমোরিতে গ্রহণ কর।
৮. বিয়োগফলটি মেমোরি থেকে প্রসেসরকে দাও সেখান থেকে প্রথম সংখ্যাটি বিয়োগ করার জন্য।
৯. বিয়োগফলটি প্রসেসর থেকে মেমোরিতে গ্রহণ কর।
১০. মেমোরি থেকে বিয়োগফলটি আউটপুটকে দাও।

একজন ইনপুট, একজন আউটপুট, একজন মেমোরি এবং অন্য একজন প্রসেসর হবে।
শ্রেণির সব শিক্ষার্থীদের চারজন করে অনেকগুলো দলে ভাগ করে নিতে হবে।
প্রথমে শিক্ষক ইনপুটকে সফটওয়্যারটি দেবেন।
ইনপুট সফটওয়্যারটি মেমোরিকে দেবে।
মেমোরিতে সফটওয়্যার লোড হওয়ার পর শিক্ষক যেকোনো একটা সংখ্যা ইনপুটকে দেবেন।
ইনপুট সংখ্যাটি মেমোরিতে দেবে। মেমোরি সংখ্যাটি নিয়ে সফটওয়্যারের ধাপগুলো একটি একটি করে প্রসেসরকে জানাবে। ১০টি ধাপ শেষ করার পর মেমোরি ফলাফলটি আউটপুটকে দেবে। আউটপুট সেটি শিক্ষককে জানাবে।
শিক্ষক ফলাফলটি পরীক্ষা করে দেখবেন সেটি সঠিক হয়েছে কি না। (সঠিক উত্তর ২০)

বিষয়টি কীভাবে হচ্ছে শিক্ষার্থীরা বুঝে যাওয়ার পর তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া হবে তারা নিজেরাই যেন এক ধরনের সফটওয়্যার লিখে সেগুলো ব্যবহার করে।

এখানে সফটওয়্যারটি সোজা বাংলায় লেখা হয়েছে। সত্যিকারের কম্পিউটারে সেগুলো কম্পিউটারের ভাষায় লিখতে হয়, সেটাকে বলা হয় প্রোগ্রামিং করা। তোমরা যখন বড় হয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে তখন তোমরা নিজেরাই সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম লিখতে পারবে।

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main() {
        int var1, var2, result;

        printf("Enter first number: ");
        scanf ("%d", &var1);

        printf ("Enter second number: ");
        scanf ("%d", &var2);

        result = var1+var2;

        printf ("result of %d and %d is %d", var1, var2, result);
        getch():
        return 0;
}
```

আমরা ওপরের এই প্রোগ্রামটি পড়ে বুঝতে পারি না, কম্পিউটার কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারে।

পাঠ ৩ : ইনপুট ডিভাইস

আমরা গত দুটি পাঠে দেখেছি কম্পিউটারে তথ্য উপাত্ত প্রবেশ করানোর জন্যে এক ধরনের ইনপুট ডিভাইসের দরকার হয়। আমরা আগেই বলেছি কী-বোর্ড কিংবা মাউস সেরকম ইনপুট ডিভাইস।

কী-বোর্ড দিয়ে বাংলায় বা ইংরেজিতে বা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় লেখা যায় অর্থাৎ কী-বোর্ডের একটি বোতাম চাপলে কম্পিউটারের ভেতর সেই বোতামের জন্যে নির্দিষ্ট অক্ষরটি ঢুকে যায়।

আমরা যে সবসময় অক্ষর বা শব্দ লিখি তা নয়- মাঝেমধ্যে আমাদের অন্য কিছু করতে হয়। যেমন- আমরা যদি একটা ছবি আঁকতে চাই তখন কী-বোর্ড দিয়ে সেটি করা যায় না। একটি মাউস নাড়িয়ে আমরা সেটা করতে পারি।

অনেক সময় পুরো একটা ছবিকে কম্পিউটারে প্রবেশ করানো যায়। যদি ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবিটি তোলা থাকে তাহলে সেটা সরাসরি ক্যামেরা থেকে কম্পিউটারে দিয়ে দেওয়া যায়। যদি ছবিটি প্রিন্ট অবস্থায় থাকে, তাহলে সেটিকে স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করে কম্পিউটারে প্রবেশ করানো যায়। কাজেই ডিজিটাল ক্যামেরা আর স্ক্যানারও এক ধরনের ইনপুট ডিভাইস।

কিছু ইনপুট ডিভাইস

কী- বোর্ড (Keyboard)

মাউস (Mouse)

ডিজিটাল ক্যামেরা (Digital Camera)

স্ক্যানার (Scanner)

ওয়েব ক্যাম (Web Cam)

ভিডিও ক্যামেরা (Video Camera)

ডিজিটাল ক্যামেরার মতো ভিডিও ক্যামেরা বা ওয়েব ক্যামও ইনপুট ডিভাইস, সেগুলো দিয়ে ভিডিও কম্পিউটারে প্রবেশ করানো যায়। যারা কম্পিউটারে গেম খেলে তারা অনেক সময় জয়স্টিক (joystick) ব্যবহার করে সেগুলো দিয়ে গেমের তথ্য কম্পিউটারে প্রবেশ করায় সেগুলোও ইনপুট ডিভাইস। তোমরা

অনেকেই পরীক্ষার খাতায় বৃত্ত ভরাট করতে দেখেছ। যে যন্ত্রগুলো এই বৃত্ত ভরাট করা খাতা পড়তে পারে, সেগুলোও ইনপুট ডিভাইস— কারণ পরীক্ষার খাতার তথ্যগুলো এই যন্ত্রটি কম্পিউটারে প্রবেশ করিয়ে দেয়। নিচে আরও কতগুলো ইনপুট ডিভাইসের ছবি দেখানো হলো।

জয়স্টিক (Joystick)

ওএমআর (OMR)

মাইক্রোফোন (Microphone)

বারকোড রিডার
(Barcode Reader)

কাজ

১. যে সব ইনপুট ডিভাইসের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো ছাড়া অন্য কী কী ইনপুট ডিভাইস হতে পারে সেটা নিয়ে কল্পনা করে লিখ।

২. ইনপুট ডিভাইস শুধু তথ্য-উপাত্ত কম্পিউটারে দেওয়া যায়। সেখান থেকে কোনো তথ্য ইনপুট ডিভাইসে বের হতে পারবে না। তুমি কি কোনো ইনপুট ডিভাইসের কথা কল্পনা করতে পারবে যেটা একই সাথে আউটপুট ডিভাইস হিসেবেও কাজ করবে?

নতুন শিখলাম : কী-বোর্ড, মাউস, ডিজিটাল ক্যামেরা, স্ক্যানার, ভিডিও ক্যামেরা, ওয়েবক্যাম, জয়স্টিক, ওএমআর, বারকোড রিডার।

পাঠ ৪: মেমোরি ও স্টোরেজ ডিভাইস

তোমরা যদি আগের পাঠগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ে থাক তাহলে এতক্ষণে খুব ভালো করে জেনে গেছ যে, কম্পিউটারের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মেমোরি, যেখানে তথ্য উপাত্তগুলো জমা করে রাখা হয়। আর সেখান থেকেই প্রসেসর তথ্য উপাত্ত নিয়ে তার ওপর কাজ করে। কাজেই কম্পিউটারে কোনো কাজ করতে হলেই সেটাকে মেমোরিতে নিয়ে রাখতে হয়। মেমোরিটা কম্পিউটারের ভেতরে থাকে বলে আমরা সাধারণত সেগুলো দেখতে পাই না, তাই তোমাদের বইয়ে এই ছবি দেওয়া হলো। মেমোরিতে তথ্য উপাত্তগুলো ক্রমানুসারে সাজানো থাকে—যখন খুশি যেকোনো জায়গা থেকে যদি তথ্য উপাত্ত নেওয়া যায় তখন তাকে বলে র‍্যাম (RAM– Random Access Memory)। বুঝতেই পারছ র‍্যামে কোনো উপাত্ত রাখা হলে সেটি মোটেই স্থায়ীভাবে থাকে না, যখন খুশি তার ওপর অন্য তথ্য উপাত্ত রাখা যায় তখন আগেরটি মুছে যায়।

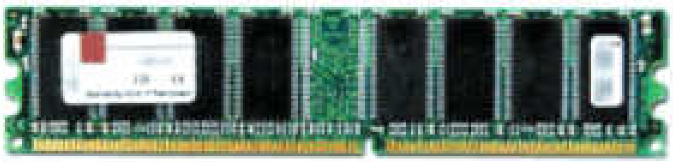

একটি র‍্যামের ছবি, এক গিগা র‍্যামে প্রায় দশ লক্ষ শব্দের সমান তথ্য রাখা যায়

মেমোরিতে একটা তথ্য মুছে অন্য তথ্য রাখা যায় শুনে তোমরা নিশ্চয়ই খানিকটা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছ। তার কারণ অনেক খাটাখাটুনি করে তুমি হয়তো বিশাল একটা সফটওয়্যার তৈরি করেছ, সেটা মেমোরিতে রাখা হয়েছে, সেটা ব্যবহার করে তুমি অনেক কাজকর্মও করেছ। এখন যদি অন্য কেউ তোমার কম্পিউটারে অন্য একটি সফটওয়্যার চালাতে চায় তাহলে তোমার সফটওয়্যার মুছে যাবে! তোমার এতদিনের পরিশ্রম এক নিমিষে উধাও হয়ে যাবে? সেটা তো কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না!

আসলেই সেটা হতে হয় না। র‍্যামে তথ্য উপাত্ত রাখা হয় সাময়িকভাবে, স্থায়ীভাবে সেটা অন্য কোথাও রাখতে হয়। সেগুলোকে বলে স্টোরেজ ডিভাইস। স্টোরেজ ডিভাইস থেকে ব্যবহারের সময় মেমোরিতে আনা হয়। সবচেয়ে পরিচিত স্টোরেজ ডিভাইসের নাম হচ্ছে হার্ডডিস্ক ড্রাইভ। র‍্যামে যে তথ্যগুলো থাকে সেগুলো অস্থায়ী, কম্পিউটার বন্ধ করলেই সেটা উধাও হয়ে যায়। হার্ডডিস্ক ড্রাইভে যেটা জমা রাখা থাকে সেটা কম্পিউটার বন্ধ করলে উধাও হয়ে যায় না— তবে তুমি ইচ্ছে করলে একটা তথ্য মুছে অন্য একটা তথ্য রাখতে পারবে।

হার্ডডিস্ক ড্রাইভগুলো সাধারণত কম্পিউটারে স্থায়ীভাবে লাগানো থাকে। তাই এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে তথ্য নেওয়ার জন্য অন্য কোনো একটা পদ্ধতি দরকার।

হার্ড ড্রাইভের ডিস্কটি প্রতি মিনিটে ৫৪০০ থেকে ৭২০০ বার ঘুরতে থাকে।

বিভিন্ন সময়ে তার বিভিন্ন সমাধান এসেছে, এই মুহূর্তে একটা খুবই জনপ্রিয় সমাধানের নাম হচ্ছে পেনড্রাইভ বা ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ (USB Flash Drive)। সেগুলো এত ছোটো যে কলমের মতো পকেটে নিয়ে ঘোরা সম্ভব, এমনকি একটার মধ্যেই দশ থেকে বিশ হাজার বই রেখে নিতে পারবে।

পেনড্রাইভ

এসএসডি

এসএসডি বা সলিড স্টেইট ড্রাইভ (Solid State Drive-SSD)

বর্তমানে হার্ডডিস্কের বিকল্প হিসেবে এসএসডি বা সলিড স্টেইট ড্রাইভ নামে এক ধরনের স্টোরেজ ডিভাইস জনপ্রিয় হয়েছে। এতে ডেটা সংরক্ষণের জন্য ফ্লাশ মেমরি ব্যবহার করা হয়। সার্ভার, ওয়ার্কস্টেশনসহ সকল ধরনের ডিজিটাল কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ডিভাইস, মিডিয়া প্লেয়ার ইত্যাদিতে এসএসডি ব্যবহার করা যায়। বাজারে ৩.৫", ২.৫", ১.৮" এর গুণিতক মাপের এসএসডি পাওয়া যায়। এসএসডি স্টোরেজের ধারণ ক্ষমতা ১২৮ জিবি (GB), ২৫৬ জিবি, ৫১২ জিবি, ১ টিবি (TB) এবং ২ টিবি পর্যন্ত দেখা যায়। কয়েকটি স্ট্যান্ড-এলোন এসএসডি মডেলের ধারণক্ষমতা ৪ থেকে ৮ টিবি পর্যন্ত পাওয়া যায়।

নতুন শিখলাম : স্টোরেজ ডিভাইস, র‍্যাম, হার্ডডিস্ক, সিডি, পেনড্রাইভ, এসএসডি।

পাঠ ৫: প্রসেসর ও মাদারবোর্ড

কম্পিউটারের প্রত্যেকটা অংশই খুব গুরুত্বপূর্ণ, তার যেকোনো একটা অংশ না থাকলেই কম্পিউটার আর ব্যবহার করা যাবে না। তারপরও যে অংশটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে প্রসেসর। আমরা আগেই বলেছি, কম্পিউটারের প্রসেসর মেমোরি থেকে তথ্য দেওয়া-নেওয়া করে এবং সেগুলো প্রক্রিয়া করে। মেমোরির মতো প্রসেসরও কম্পিউটারের ভেতরে থাকে বলে আমরা সাধারণত সেটা দেখতে পাই না। কিন্তু যদি আমরা একটা কম্পিউটারকে খুলে দেখি তাহলে সেটা আমাদের আলাদাভাবে চোখে পড়বেই।

আমরা যদি একটা কম্পিউটারকে খুলে ফেলি তাহলে সাধারণত একটা বোর্ডকে দেখতে পাব যেখানে অসংখ্য ইলেকট্রনিক্স খুঁটিনাটি লাগানো আছে। এই বোর্ডটার নাম মাদারবোর্ড এবং এটি কম্পিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মা যেভাবে সবাইকে বুকে আগলে রাখে, এই বোর্ডটাও কম্পিউটারের সবকিছু সেভাবে বুকে আগলে রাখে। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে মাদারবোর্ড। একে মেইন সার্কিট বোর্ড, সিস্টেম বোর্ড বা লজিক বোর্ডও বলে। মাদারবোর্ডের ডিভাইসগুলোর মাঝে আমরা দেখতে পাব একটা বেশ বড়ো ডিভাইস। সেটাই প্রসেসর। যার উপর রীতিমতো একটা ফ্যান লাগানো থাকে।

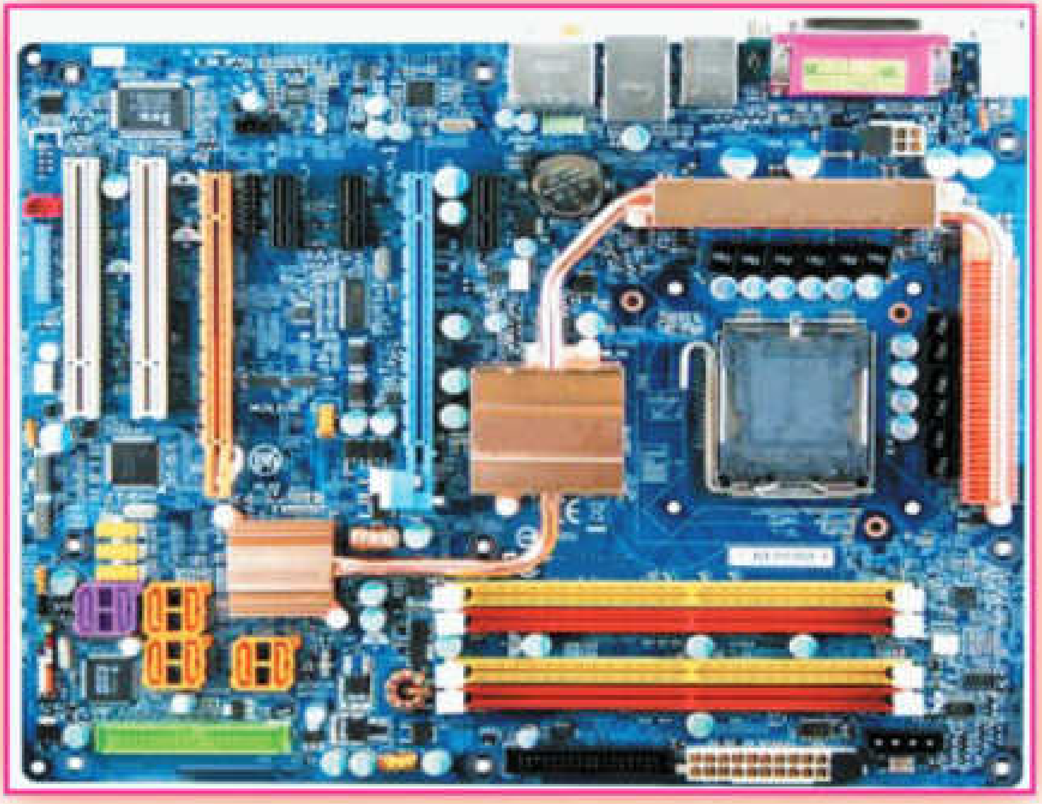

মাদারবোর্ড (Motherboard)

প্রসেসর প্রতি মুহূর্তে লক্ষ কোটি হিসাবনিকাশ করে বলে প্রসেসরের মধ্য দিয়ে অনেক বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় আর সেটা এত গরম হয়ে ওঠে যে একে আলাদাভাবে ফ্যান দিয়ে ঠান্ডা না করলে সেটা জ্বলে পুড়ে যেতে পারে!

প্রসেসর (processor)

মাদারবোর্ডে যেসব ইলেকট্রনিক্স খুঁটিনাটি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রসেসর। বিশ্বের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রসেসর তৈরি করে। যেমন-ইনটেল, এএমডি, এনভিডিয়া, মটোরোলা, এআরএম, আলতেরা ইত্যাদি।

কাজ

প্রসেসর অনেক গরম হয় বলে সেটাকে ফ্যান দিয়ে ঠান্ডা করতে হয়। সুপার কম্পিউটারে হাজার হাজার প্রসেসর থাকে, সেটাকে শুধু ফ্যান দিয়ে ঠান্ডা করা যায় না–সেটাকে কীভাবে ঠান্ডা করা যায় সেটা নিয়ে তোমার নিজের একটা সমাধান দাও।

নতুন শিখলাম : মাদারবোর্ড, বিদ্যুৎ প্রবাহ, প্রসেসর।

পাঠ ৬: আউটপুট ডিভাইস

তোমরা এর মাঝে জেনে গেছ যে, ইনপুট ডিভাইস দিয়ে কম্পিউটারের ভেতর তথ্য উপাত্ত পাঠানো হয়। কম্পিউটার মেমোরি আর প্রসেসর দিয়ে সেই তথ্য উপাত্তের ওপর কাজ করে, যে ফলাফল পাওয়া যায় সেটা আউটপুট ডিভাইস দিয়ে বাইরের জগতে পাঠিয়ে দেয়। আগের পাঠগুলো থেকে তোমরা জেনে গেছ যে, মনিটর আর প্রিন্টার এক ধরনের আউটপুট ডিভাইস।

তোমরা যারাই কম্পিউটার দেখেছ বা ব্যবহার করেছ কিংবা কম্পিউটারের ছবি দেখেছ তারা সবাই কম্পিউটারের মনিটরটিকে আলাদাভাবে চিনতে পার, কারণ সেটা দেখতে অনেকটা টেলিভিশনের মতো। কম্পিউটারের ভেতর যা কিছু ঘটে সেটাকে মনিটরে দেখানো যায়। তাই যারা কম্পিউটার ব্যবহার করে তারা কম্পিউটারের মনিটরের ওপর চোখ রেখে কম্পিউটার ব্যবহার করে। তুমি যদি কম্পিউটারে কিছু লিখ তাহলে মনিটরে সেটা দেখতে পাবে–যদি কোনো ছবি আঁক, সেটাও তুমি দেখতে পাবে!

কোনো কিছু যখন কম্পিউটারের মনিটরে দেখা যায়, সেটা মোটেও স্থায়ী কিছু নয়–নতুন কিছু এলেই আগেরটা আর থাকে না। তাই যদি স্থায়ীভাবে কিছু সংরক্ষণ করতে হয়, তাহলে অন্য কিছুর দরকার হয়। আর তার জন্যে সবচেয়ে সহজ সমাধান হচ্ছে প্রিন্টার। এই বইয়ের জন্যে যা কিছু লেখা হয়েছে, সবকিছু প্রথমে একটা প্রিন্টার ব্যবহার করে ছাপিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বই বা চিঠিপত্র ছাপানোর জন্য সাধারণ মাপের কাগজে প্রিন্ট করানো যায়। কিন্তু যদি কোনো বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপন, পোস্টার, ব্যানার, বাড়ির নকশা ছাপাতে হয়, তাহলে আর সাধারণ প্রিন্টার ব্যবহার করা যায় না- তখন প্লটার ব্যবহার করতে হয়।

আমরা যে আউটপুট ডিভাইস ব্যবহার করে সব সময়েই কিছু একটা প্রিন্ট করে স্থায়ীভাবে রাখতে চাই তা নয়, অনেক সময় আমরা শব্দকেও আউটপুট হিসেবে পেতে চাই। যেমন আমরা হয়ত গান শুনতে চাই। কাজেই শব্দকে আউটপুট হিসেবে পাওয়ার জন্যে কম্পিউটারের সাথে স্পিকার লাগাতে পারি, তাই স্পিকারও হচ্ছে এক ধরনের আউটপুট ডিভাইস।

মনিটরে আমরা দেখতে পাই, স্পিকারে শুনতে পাই। তাই কম্পিউটার আসলে বিনোদনের একটা বড়ো মাধ্যম হয়ে গেছে। কম্পিউটারের ছোটো মনিটরে এক সাথে একজন দেখতে পার–অনেক সময়ই সেটা যথেষ্ট নয়। অনেক সময়ই এক সাথে অনেকের দেখার দরকার হয়। যখন কেউ বক্তৃতা, আলোচনা বা সেমিনারে কোনো কিছু উপস্থাপন করে, কিংবা যদি আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা বা সিনেমা দেখতে চাই তখন মনিটরের দৃশ্যটি অনেক বড়ো করে দেখাতে হয়। এরকম কাজের জন্য মাল্টিমিডিয়া বা ভিডিও প্রজেক্টর ব্যবহার করা হয়।

মনিটর

প্রজেক্টর মনিটরের দৃশ্যটি অনেক বড়ো করে বিশাল স্ক্রিনে দেখাতে পারে। একসময় কম্পিউটার মনিটর সবচেয়ে বেশি জায়গা দখল করত, তবে আজকাল মনিটরগুলো হয়ে গেছে পাতলা।

ইনপুট ডিভাইস নিয়ে আলোচনা করার সময় তোমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল এমন কিছু কি হতে পারে যেটা একই সাথে ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইস দুটোই হতে পারে? অবশ্যই হতে পারে এবং এরকম যন্ত্র বা ডিভাইসের নাম হচ্ছে টাচস্ক্রিন! টাচস্ক্রিনের একটা স্ক্রিন আছে যেটা মনিটরের মতো কাজ করে এবং সেই স্ক্রিনে টাচ বা স্পর্শ করে তার ভেতর তথ্য পাঠানো যায়। আজকাল শুধু কম্পিউটারের জন্যে নয় মোবাইল টেলিফোনের পর্যন্ত টাচস্ক্রিন রয়েছে।

প্রিন্টার

প্রিন্টারে শুধু যে ঝকঝকে ছাপানো যায় তাই নয় সেই ছাপা হতে পারে পুরোপুরি রঙিন

প্লটার

বড়ো বড়ো ছবি, ব্যানার পোস্টার ছাপানোর জন্য রয়েছে প্লটার

স্পিকার

শব্দকেও আউটপুট হিসেবে পেতে হয়–তখন স্পিকার হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর

মনিটরের দৃশ্য অনেক বড়ো করে স্ক্রিনে দেখানোর জন্য রয়েছে ভিডিও বা মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর

টাচ স্ক্রিন

টাচ স্ক্রিন একই সাথে ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইস

কিছু ডিভাইস ইনপুট ও আউটপুট উভয় হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন-টাচস্ক্রিন, পেনড্রাইভ, এসএসডি, হার্ডডিস্ক ইত্যাদি।

> কাজ
>
> তোমরা কি নতুন কোনো একটা আউটপুট ডিভাইসের কথা কল্পনা করতে পার? যা দিয়ে দেখা বা শোনা ছাড়াও আমরা অন্য কিছু করতে পারি?

২০২৫

নতুন শিখলাম : মনিটর, প্রিন্টার, প্লটার, স্পিকার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, টাচ স্ক্রিন।

পাঠ ৭: সফটওয়্যার

ইনপুট, আউটপুট, মেমোরি এবং প্রসেসর এর সবই হচ্ছে যন্ত্রপাতি বা হার্ডওয়্যার। কম্পিউটারে এই যন্ত্রপাতিগুলো সফটওয়্যারের সাহায্যে সচল এবং অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই পাঠে আমরা সেগুলো একটু আলোচনা করব।

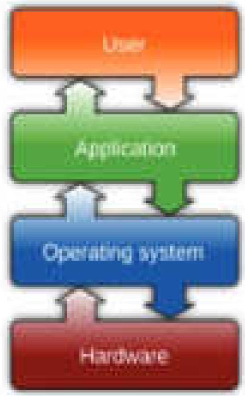

খুব সাধারণভাবে কম্পিউটারের সফটওয়্যারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি, আমরা কম্পিউটার দিয়ে লিখতে পারি, ছবি আঁকতে পারি, গান শুনতে পারি, ইন্টারনেটে ঘুরে বেড়াতে পারি এবং এরকম আরও অসংখ্য কাজ বা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারি, তাই এই ধরনের সফটওয়্যারকে বলে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার।

কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে সোজাসুজি একটা কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায় না। কম্পিউটারে যদি সেগুলো ব্যবহার করতে হয়, তাহলে কম্পিউটারকে আগে অন্য একটা সফটওয়্যার দিয়ে সচল করে রাখতে হয়। সেই সফটওয়্যারের নাম হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার বা সংক্ষেপে অপারেটিং সিস্টেম বা আরও সংক্ষেপে ওএস (OS)। একটা কম্পিউটারকে যখন প্রথম সুইচ টিপে অন করা হয়, সাথে সাথে অপারেটিং সিস্টেম তার কাজ শুরু করে দেয়। সে কম্পিউটারের সব যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখে, সব যন্ত্রপাতিকে একটির সাথে আরেকটির যোগাযোগ করিয়ে দেয়, ইনপুট আউটপুটকে সচল করে। কম্পিউটারে যদি কিছু তথ্য জমা রাখতে হয় সেগুলো জমা রাখার ব্যবস্থা করে ইত্যাদি।

কাজেই অপারেটিং সিস্টেম একটা কম্পিউটারকে সচল করে রাখে, ব্যবহারের উপযোগী করে রাখে অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের অনেক কাজকে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখে; যেন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারে।

বড় বড় সুপার কম্পিউটারের নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে। আমাদের পরিচিত যে পিসি বা পারসোনাল কম্পিউটার রয়েছে, সেগুলোর অপারেটিং সিস্টেমগুলোর নাম হচ্ছে উইন্ডোজ, ম্যাক, ইউনিক্স ইত্যাদি। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার যেরকম টাকা দিয়ে কিনতে হয়, অপারেটিং সিস্টেমও কিন্তু সেভাবে টাকা দিয়ে কিনতে হয় এবং এগুলো যথেষ্ট মূল্যবান। পৃথিবীর অনেক কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা মিলে তাই এক ধরনের মুক্ত অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করেছেন, যেগুলো বিনামূল্যে পাওয়া যায়। বিনামূল্যে পাওয়া যায় বলে তোমরা কিন্তু মনে কোরো না সেগুলো কার্যকর নয়। সেগুলো অত্যন্ত চমৎকার অপারেটিং সিস্টেম। এরকম একটি মুক্ত অপারেটিং সিস্টেমের নাম হচ্ছে লিনাক্স, যেটা পৃথিবীজুড়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম !

উইনডোজ | ম্যাক | লিনাক্স

Windows Logo for Smart Phone or Tab

উইন্ডোজ, ম্যাক এবং মুক্ত সফটওয়্যার লিনাক্সের স্ক্রিন ব্যবহার করার মধ্যে কোনো বড়ো ধরনের পার্থক্য নেই। স্মার্ট ফোন, ট্যাবলেট এবং প্যাডের জন্য বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম যেমন এ্যান্ড্রয়েড, আইওএস, উইন্ডোজ, ক্রমওএস এবং কাইওএস ব্যবহার করা হয়।

কাজ

অনেক টাকা দিয়ে উইন্ডোজ সফটওয়্যার কেনা ভালো, নাকি না কিনে বেআইনিভাবে উইন্ডোজ সফটওয়্যার জোগাড় করে সেটি ব্যবহার করা ভালো, নাকি বিনামূল্যের লিনাক্স সফটওয়্যার ব্যবহার করা ভালো, সেটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে তিনটি দলে ভাগ হয়ে বিতর্ক কর।

নতুন শিখলাম : উইন্ডোজ, ম্যাক, ইউনিক্স লিনাক্স, অপারেটিং সিস্টেম, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার

পাঠ ৮ : অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার

তোমরা যারা আগের পাঠগুলো পড়ে এসেছ, তারা সবাই এরই মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলতে কী বোঝানো হয় সেটা জেনে গেছ। আমরা আগেই বলেছি, কম্পিউটার দিয়ে কী কী কাজ করা সম্ভব সেটা নির্ভর করে আমাদের সৃজনশীলতার ওপর। আমরা যেকোনো একটা কাজ খুঁজে বের করে সেটা করার জন্যে একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করে ফেলতে পারি।

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার দু'ধরনের : ১। প্যাকেজ সফটওয়্যার ২। কাস্টমাইজড সফটওয়্যার

যে কাজগুলো প্রায় সবারই করতে হয়, সেগুলোর জন্যে আলাদাভাবে অনেকেই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করে ফেলে। যেমন, লেখালেখির অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার-এটাকে বলে ওয়ার্ড প্রসেসর। এটি সবাই ব্যবহার করতে চায় বলে অনেক চমৎকার ওয়ার্ড প্রসেসর তৈরি হয়েছে। ঠিক সেরকম ছবি আঁকার জন্যে, গান শোনার জন্যে, ভিডিও দেখার জন্যে, নানা ধরনের কম্পিউটার গেম খেলার জন্যে, ইন্টারনেটে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে আলাদাভাবে সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এই ধরনের সফটওয়্যারের নাম হচ্ছে প্যাকেজ সফটওয়্যার। বিভিন্ন কোম্পানি যেরকম গাড়ি, টেলিভিশন, ক্যামেরা তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে টাকা উপার্জন করে, ঠিক সেরকম পৃথিবীর অনেক কোম্পানি প্যাকেজ সফটওয়্যার তৈরি করে মানুষের কাছে বিক্রয় করে টাকা উপার্জন করে। তোমরা শুনে হয়ত অবাক হবে সারা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষদের অনেকেই প্যাকেজ সফটওয়্যার বিক্রি করে ধনী হয়েছে।

আমরা একটু আগে বলেছি, সব ধরনের কাজের জন্যেই কোনো না কোনো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আছে। তাহলে কি সফটওয়্যার তৈরি করার সফটওয়্যার আছে? অবশ্যই আছে, আমরা তোমাদের আগেই বলেছি তোমরা যখন আরেকটু বড়ো হয়ে প্রোগ্রামিং করা শিখবে, তখন তোমরা ইচ্ছে করলে সফটওয়্যার তৈরি করার সফটওয়্যার ব্যবহার করে নানা ধরনের বিশেষ সফটওয়্যার তৈরি করতে পারবে! একটা বিশেষ কাজের জন্যে যখন আলাদাভাবে একটা বিশেষ সফটওয়্যার তৈরি করা হয়, তখন তাকে বলে কাস্টমাইজড সফটওয়্যার।

অপারেটিং সিস্টেম যেন পৃথিবীর মানুষ বিনামূল্যে পেতে পারে সেজন্যে যেরকম পৃথিবীর বড়ো বড়ো কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করেছেন ঠিক সেরকম নানা ধরনের প্যাকেজ সফটওয়্যারও সেভাবে তৈরি করা হয়েছে। প্রায় বিনামূল্যে তোমরা এই সফটওয়্যারগুলো পেতে পার এবং ব্যবহার করতে পার।

সারা পৃথিবীজুড়ে বিজ্ঞানীরা প্রায় বিনামূল্যে সবার কাছে সব ধরনের সফটওয়্যার পৌঁছে দেওয়ার জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বড়ো হয়ে তোমরাও হয়ত এই ধরনের আন্দোলনে যোগ দেবে!

বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহার করার সময় মনিটরের দৃশ্য :

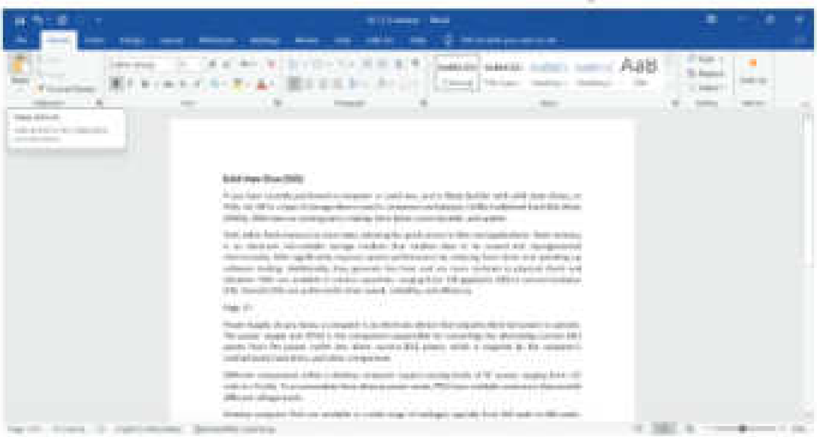

লেখালেখি করার সফটওয়্যার

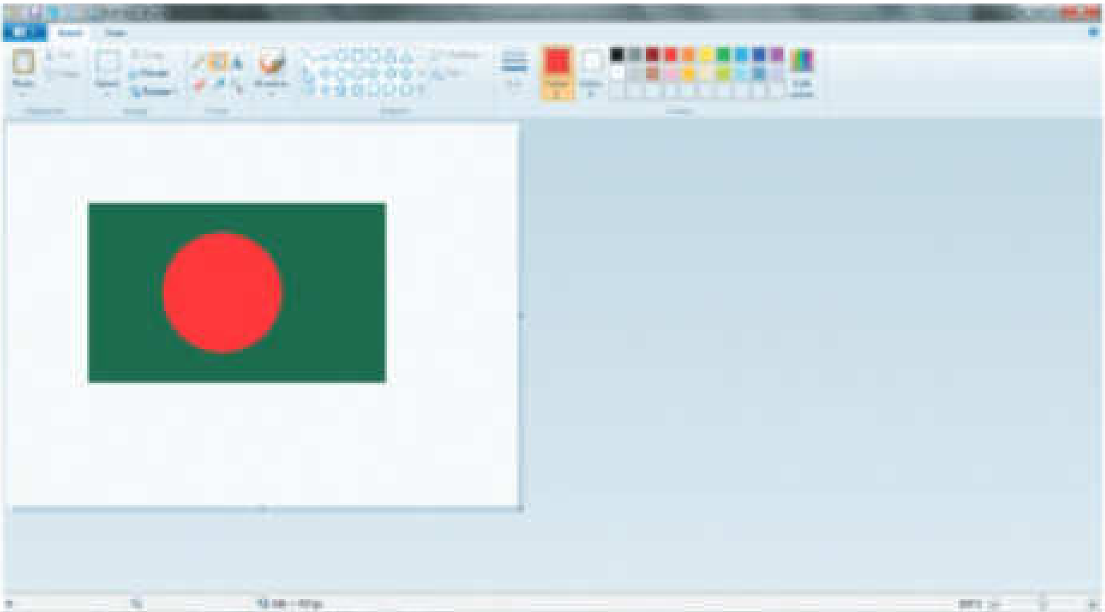

ছবি আঁকার সফটওয়্যার

গেম খেলার সফটওয়্যার

কাজ

- কী কী কাজ করার জন্যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করা সম্ভব তার একটা তালিকা কর।
- তালিকাটিতে দশটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের নাম লেখার জন্য শ্রেণির সবাই মিলে চেষ্টা কর।

নতুন শিখলাম : প্যাকেজ সফটওয়্যার, কাস্টমাইজড সফটওয়্যার, ওয়ার্ড প্রসেসর।

পাঠ ৯ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আরও কিছু যন্ত্রপাতি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হয় সেরকম যন্ত্রপাতির কথা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এই প্রযুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের কথা আলোচনা করেছি। এখন আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হয় এরকম আরও কিছু যন্ত্রপাতির কথা আলোচনা করব।

ল্যান্ডফোন এবং মোবাইল ফোন: একসময় ফোনে কথাবার্তা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানোর জন্য বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করা হতো এবং তারের ভেতর দিয়ে আমাদের কথাবার্তাগুলো বৈদ্যুতিক সংকেত হিসেবে আসা-যাওয়া করত। যেহেতু বৈদ্যুতিক তার দিয়ে সংকেত পাঠাতে হতো তাই টেলিফোনে সব সময়ই তারের সংযোগ রাখতে হতো এবং আমরা সেগুলোকে বলি ল্যান্ডফোন।

প্রযুক্তির উন্নতি হওয়ার কারণে আমরা ইচ্ছা করলে তার দিয়ে না পাঠিয়ে বেতার বা ওয়্যারলেস সংকেত পাঠাতে পারি। যেহেতু তারের সাথে এই ফোনের সংযোগ রাখার প্রয়োজন নেই, তাই আমরা ইচ্ছে করলেই এই ফোনগুলোকে পকেটে নিয়ে ঘুরতে পারি। সেজন্য এই ফোনকে আমরা বলি মোবাইল (ভ্রাম্যমাণ!) ফোন। এই ফোনের দাম অনেক কমে এসেছে তাই দেশের সাধারণ মানুষেরাও এখন এটা ব্যবহার করতে পারে।

শুধু যে মোবাইল ফোনের দাম কমেছে তা নয়, মোবাইল ফোন এখন ধীরে ধীরে স্মার্টফোন হয়ে দাঁড়িয়েছে! এই ফোন দিয়ে আমরা ছবি তুলতে পারি, গান শুনতে পারি, রেডিও শুনতে পারি, জিপিএস দিয়ে পথেঘাটে চলাফেরা করতে পারি, গেম খেলতে পারি এমনকি ইন্টারনেট পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারি! কাজেই আমরা অনুমান করতে পারি, ভবিষ্যতে এই মোবাইল টেলিফোন অনেক সময়ই কম্পিউটারের কাজগুলো করতে পারবে!

মোবাইল

মডেম

মডেম: মডেম হলো এমন একটি যন্ত্র যা তোমার কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং অন্যান্য ডিভাইসগুলিকে ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত করে। এটি ডিভাইসগুলি থেকে ডিজিটাল সিগন্যালগুলিকে এনালগ সিগন্যালে রূপান্তরিত করে, যা টেলিফোন লাইন বা কেবলের মাধ্যমে প্রেরণ করা যায়।

স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ: আমরা যদি পৃথিবীর এক পৃষ্ঠ থেকে অন্য পৃষ্ঠে তথ্য পাঠাতে চাই তাহলে অনেক সময় উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট ব্যবহার করা হয়। পৃথিবী থেকে মহাকাশের দিকে মুখ করে থাকা এন্টেনা দিয়ে তথ্যগুলো উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটে পাঠানো হয়। স্যাটেলাইট সিগন্যালটি গ্রহণ করে আবার অন্যদিকে পাঠিয়ে দেয়। টেলিভিশনের অসংখ্য চ্যানেল এভাবে সারা পৃথিবীতে বিতরণ করা হয়। ১২ মে ২০১৮ বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মহাকাশে প্রেরণ করা হয়। নিজস্ব স্যাটেলাইটের অধিকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ পৃথিবীর ৫৭তম দেশ।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের দৃশ্য

অপটিক্যাল ফাইবার
সরু তন্তু বা ফাইবারের ভিতর দিয়ে অদৃশ্য আলোর মাধ্যমে অচিন্তনীয় পরিমাণ তথ্য পাঠানো সম্ভব

অপটিক্যাল ফাইবার: একসময় পৃথিবীর সব তথ্যই পাঠানো হতো তারের ভেতর বৈদ্যুতিক সংকেত অথবা তারবিহীন ওয়্যারলেস সংকেত হিসেবে। এখন সারা পৃথিবীতেই তথ্য উপাত্ত পাঠানোর জন্য একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রযুক্তি গড়ে উঠেছে সেটি হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার প্রযুক্তি। অপটিক্যাল ফাইবার আসলে কাচের অত্যন্ত স্বচ্ছ তন্তু, সেটি চুলের মতো সরু এবং এর ভেতর দিয়ে আলোর সংকেত হিসেবে তথ্য এবং উপাত্ত পাঠানো যায়। আলোর সংকেতের জন্য লেজারের আলো ব্যবহার করা হয়। তোমরা শুনে অবাক হবে এই আলো কিন্তু চোখে দেখা যায় না। একটি অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে এক কোটি টেলিফোন লাইনের সমান তথ্য পাঠানো যায়; কাজেই সেটি সারা পৃথিবীতেই যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে।

> **কাজ**
> অপটিক্যাল ফাইবার, মডেম, কম্পিউটার ব্যবহার করে কীভাবে একটা কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে তথ্য পাঠানো যায় তার একটি ছবি আঁক।

নতুন শিখলাম : মডেম, স্যাটেলাইট, এন্টেনা, অপটিক্যাল ফাইবার, লেজার, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১।

নমুনা প্রশ্ন

১. বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তারবিহীন যোগাযোগ মাধ্যম কোনটি?

ক. রেডিও   খ. টেলিভিশন
গ. মোবাইল   ঘ. ল্যান্ডফোন

২. প্রসেসরকে কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বলার কারণ হচ্ছে প্রসেসর–

i. মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে
ii. কম্পিউটারের নির্দেশক হিসেবে কাজ করে
iii. তথ্যের প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii
গ. iii   ঘ. i, ii ও iii

৩. তোমার লেখা কবিতাগুলো কম্পিউটারে দীর্ঘ সময়ের জন্য সেভ বা সংরক্ষণ করতে চাও। এক্ষেত্রে কোন ডিভাইসটি ব্যবহার করবে?

ক. র‍্যাম   খ. হার্ডডিস্ক ড্রাইভ
গ. প্রসেসর   ঘ. পেনড্রাইভ

৪. একই সাথে ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইস হিসেবে কোনটি কাজ করে?

ক. মনিটর   খ. টাচ স্ক্রিন
গ. কি-বোর্ড   ঘ. মাদার বোর্ড

৫. অপারেটিং সিস্টেমের প্রধান কাজ হচ্ছে–

ক. ইনপুট-আউটপুট অপারেশন   খ. ফাইল সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ
গ. প্রোগ্রাম পরিচালনার পরিবেশ সৃষ্টি   ঘ. বিভিন্ন ডিভাইসের ত্রুটি নির্ণয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

হাসান সাহেব তাঁর নাতি-নাতনিদের সাথে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার নিয়ে গল্প করছিলেন। তিনি বলেন, এখন একই যন্ত্রের সাহায্যে মজার মজার অনুষ্ঠান দেখা যায়, শোনা যায়, এমনকি রেকর্ড করে পরেও তা উপভোগ করা যায়। কোনো খবর যেকোনো সময় যেকোনো জায়গায় পৌঁছানো কত সহজ হয়ে গেছে। অথচ এমন একদিন ছিল যখন এগুলোর কিছুই ছিল না। জরুরি অনেক খবর পেতে কয়েক মাস লেগে যেত।

৬. হাসান সাহেবের গল্পে বিজ্ঞানের যে উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হলো–

i. স্যাটেলাইট টেলিভিশনের উন্নয়ন
ii. ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
iii. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii
গ. i ও iii   ঘ. ii ও iii

৭. হাসান সাহেব যেকোনো খবর যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে দ্রুত পাঠাতে কোন মাধ্যম ব্যবহার করবেন?

ক. ইন্টারনেট   খ. ল্যান্ডফোন
গ. রেডিও   ঘ. মোবাইল ফোন

৮. পৃথিবীর এক পৃষ্ঠ থেকে অপর পৃষ্ঠে তথ্য পাঠানোর কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তি কোনটি?

ক. অপটিক্যাল ফাইবার   খ. ইন্টারনেট
গ. মোবাইল ফোন   ঘ. স্যাটেলাইট

তৃতীয় অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কিছু কিছু যন্ত্রপাতি কেমন করে সুরক্ষা করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কম্পিউটারের পিছনে বেশি সময় দিলে কোনো সমস্যা হতে পারে কি-না তা বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ ১ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার

একটা সময় ছিল যখন ছোটো ছেলেমেয়েদের যেকোনো যন্ত্রপাতি থেকে সরিয়ে রাখা হতো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ সেই সময়টার পরিবর্তন হয়েছে। তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়েদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি থেকে সরিয়ে না রেখে বরং সেগুলো ব্যবহার করতে শেখানো হচ্ছে। এই অধ্যায়টি লেখা হয়েছে তোমরা কম্পিউটার, প্রিন্টার বা মডেমের মতো যন্ত্রপাতি যেন নিরাপদে এবং নির্ভয়ে ব্যবহার করতে পার সেটি শিখিয়ে দেওয়ার জন্যে।

যারা কম্পিউটার তৈরি করে তারা জানে আজকাল শুধু বড়ো মানুষরাই নয়, ছোটরাও কম্পিউটার ব্যবহার করে। তাই সব কম্পিউটারই তৈরি করা হয় যেন এটি ব্যবহার করে কারও কোনো বিপদ বা স্বাস্থ্য ঝুঁকি না থাকে। কম্পিউটারের একমাত্র যে বিষয়টি নিয়ে সবারই একটু সতর্ক থাকা দরকার সেটি হচ্ছে তার বৈদ্যুতিক সংযোগ। ডেস্কটপ কম্পিউটারকে সব সময় বৈদ্যুতিক সংযোগ দিতে হয়। আর ল্যাপটপ কম্পিউটারকে তার ব্যাটারি চার্জ করার সময় বৈদ্যুতিক সংযোগ দিতে হয়। বিদ্যুতের ভোল্টেজ ৫০ ভোল্টের বেশি হলে আমরা সেটা অনুভব করতে পারি। আমাদের দেশের বিদ্যুৎপ্রবাহের ভোল্টেজ ২২০ ভোল্ট, কাজেই কোনোভাবে বিদ্যুতের তার আমাদের শরীর স্পর্শ করলে আমরা ভয়ানক বৈদ্যুতিক শক অনুভব করব। আমাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন করতে বা আমাদের মাংসপেশি ব্যবহার করে হাত পা নাড়াচাড়া করার জন্যে আমাদের মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ুর ভেতর দিয়ে সংকেত পাঠানো হয়। তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে এগুলো বৈদ্যুতিক সংকেত এবং এর পরিমাণ খুবই অল্প। কেউ যখন বৈদ্যুতিক শক খায় তখন তার শরীরের ভেতর দিয়ে অনেক বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। মস্তিষ্ক থেকে পাঠানো ছোটো সংকেতগুলো তখন এই বড়ো বিদ্যুৎপ্রবাহের নিচে চাপা পড়ে যায়। সে জন্যে যখন কেউ বিদ্যুতায়িত হয়, তখন সে তার হাত পা নাড়াতে পারে না, বেশিক্ষণ হলে তার হৃৎস্পন্দন থেমে যেতে পারে। সে জন্যে বিদ্যুৎ সংযোগকে কখনো হেলাফেলা করে নিতে হয় না। বিদ্যুৎ ছাড়া আমরা আজকাল এক মুহূর্ত থাকতে পারি না। সব সময়ই বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু আমাদের লক্ষ রাখতে হবে আমরা যেন ঠিক করে এটা ব্যবহার করি। সব সময়েই যেন সঠিক সকেটে সঠিক প্লাগ ব্যবহার করে বিদ্যুতের সংযোগ নিই। আমরা কখনো খোলা তারের প্লাস্টিক সরিয়ে প্লাগে ঢুকিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ দেব না। শুধু তাই নয়, কাউকে এরকম করতে দেখলে বাধা দেবো।

বিদ্যুৎ সংযোগের বিষয়টা ঠিক করে করা হলে কম্পিউটারের আর মাত্র একটি বিষয়ে একটু সতর্ক থাকা ভালো। আমরা আগেই বলেছি কম্পিউটারের প্রসেসর অনেক গরম হতে পারে বলে আজকাল সেগুলোর ওপর আলাদা ফ্যান বসাতে হয়। মাদারবোর্ডের অন্যান্য আইসিগুলোও অনেক গরম হতে পারে। তাই কম্পিউটারের ভেতরের তাপমাত্রা বাইরের থেকে অনেক বেশি হতে পারে। কম্পিউটারের ভেতর থেকে এই গরম বাতাসকে বাইরে বের করে দেওয়ার জন্যে সব কম্পিউটারেই ফ্যান লাগানো হয়। এগুলো বাইরে থেকে বাতাস টেনে এনে ভেতরের গরম বাতাসকে ঠেলে বের করে দেয়।

কাজেই তোমরা যখনই একটা কম্পিউটার ব্যবহার করবে তখনই ভালো করে লক্ষ করবে কোন দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে আর কোন দিক দিয়ে গরম বাতাস বের হচ্ছে। সব সময়ই নিশ্চিত করবে যেন বাতাস ঢোকার এবং বের হওয়ার পথ কোনোভাবেই বন্ধ না হয়। শুধু এই বিষয়টা লক্ষ করলেই দেখবে তোমার কম্পিউটার তুমি দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবে।

তোমরা হয়তো শুনে থাকবে কেউ কেউ বলে যে, কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্যে ঘরের ভেতর এয়ার কন্ডিশনার লাগিয়ে ঘরটাকে ঠান্ডা রাখতে হয়–এই কথাগুলো একেবারেই ঠিক নয়। যে তাপমাত্রা তুমি সহ্য করতে পারবে তোমার কম্পিউটার তার থেকে অনেক বেশি তাপমাত্রা সহ্য করতে পারবে।

ত্রুটিপূর্ণ/ বিপদজনক বৈদ্যুতিক সংযোগ

সঠিক ও নিরাপদ বৈদ্যুতিক সংযোগ

কাজ

১. তোমাদের স্কুলের যেখানে যেখানে বৈদ্যুতিক সংযোগ আছে লক্ষ করে দেখ সেগুলো ঠিক করে করা হয়েছে কি না। যদি কোথাও সেটি সঠিক না হয়ে থাকে তাহলে তোমার শিক্ষকদের সেটা জানাও।

২. তোমাদের স্কুলের ডেস্কটপ এবং ল্যাপটপ কম্পিউটারগুলোর কোন দিক দিয়ে শীতল বাতাস ঢোকে এবং কোন দিক দিয়ে গরম বাতাস বের হয় সেটি খুঁজে বের কর।

কম্পিউটারের প্রসেসরকে ঠান্ডা করার জন্য তার ওপর ফ্যান লাগানো হয়

কম্পিউটারে বাতাস প্রবাহ যেন সঠিক থাকে সেটা ঠিক রাখতে হবে

নতুন শিখলাম। ভোল্টেজ, প্লাগ, প্লাগ, সকেট।

পাঠ ২ : আইসিটি যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ

যারা গাড়ি চালায় তাদের কিছুদিন পর পর গাড়ির ইঞ্জিন অয়েল পাল্টাতে হয়। যদি ঠিক করে রক্ষণাবেক্ষণ করা না হয় তাহলে গাড়িটি যে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হবে তাই নয়, এটা যাত্রীদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। গাড়ির মতো অন্য অনেক যন্ত্রপাতিকে খুব ভালো করে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। আমাদের খুব সৌভাগ্য যে কম্পিউটারের সে রকম রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় না। তারপরও তোমরা যদি কিছু ছোটখাটো বিষয় লক্ষ রাখ, দেখবে তোমাদের কম্পিউটার দীর্ঘদিন তোমাদের সঙ্গী হয়ে থাকবে।

মনিটর পরিষ্কার করতে হয় নরম সুতি কাপড় দিয়ে

মনিটর পরিষ্কার: আজকাল বেশির ভাগ কম্পিউটারের মনিটর এলসিডি বা এলইডি মনিটর এবং এ ধরনের মনিটর তোমাদের পরিষ্কার করার চেষ্টা না করাই ভালো। এর পৃষ্ঠদেশ কাচ নয়। তাই পরিষ্কার করার চেষ্টা করার সময় খুব সহজে দাগ পড়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, পরিষ্কার করার সময় ঘষাঘষি করলে মনিটরের ভেতরে পিক্সেলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তবে সিআরটি মনিটরে যদি ধুলোবালি পড়ে অপরিষ্কার হয় তাহলে প্রথমে নরম সুতি কাপড় দিয়ে মুছে সেটা পরিষ্কার করতে পারো। তারপরও যদি ময়লা থাকে তাহলে নরম সুতি কাপড়টিতে একটু গ্লাস ক্লিনার লাগিয়ে মুছে নিতে পারো। যদি গ্লাস ক্লিনার না থাকে তাহলে এক গ্লাস পানিতে এক চামচ ভিনেগার দিয়ে সেটাকে গ্লাস ক্লিনার হিসেবে ব্যবহার করতে পারো।

> মনে রাখবে, কম্পিউটারের যেকোনো অংশ পরিষ্কার করার সময় কম্পিউটার বন্ধ করে তার বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ করে দিতে হবে।

পানি বা তরল: কম্পিউটার ব্যবহার করার সময় তার খুব কাছাকাছি পানি বা কোনো ধরনের ড্রিংক না রাখা ভালো। হঠাৎ করে হাতে লেগে সেটা যদি তোমার কম্পিউটারের ওপর পড়ে যায় তাহলে সেটা তোমার কম্পিউটারের ক্ষতি করতে পারে। পানি বা অন্যান্য পানীয় বিদ্যুৎপরিবাহী কম্পিউটারের ভেতরে ঢুকে গেলে বৈদ্যুতিক সার্কিটগুলো শর্ট সার্কিট হতে পারে। এরকম কিছু হলে সাথে সাথে কম্পিউটার বন্ধ করে দীর্ঘ সময় একটা ফ্যানের নিচে রেখে দাও যেন পানিটুকু শুকিয়ে যায়।

ধুলোবালি: আমাদের দেশে ধুলোবালি একটু বেশি। কম্পিউটারের ফ্যান যখন বাতাস টেনে নেয় তার সাথে ধুলোবালিও টেনে আনতে পারে, ধুলোবালি জমে যদি বাতাস ঢোকার এবং বের হওয়ার পথগুলো বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কম্পিউটার বেশি গরম হয়ে উঠতে পারে। তাই মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখ সেখানে বেশি ধুলো জমেছে কি না। জমে থাকলে একটু পরিষ্কার করে নিও। তবে নিজে থেকে কম্পিউটার খুলে কখনো তার ভেতরে পরিষ্কার করতে যেয়ো না।

কী-বোর্ড পরিষ্কার: কী-বোর্ডটি মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা ভালো। কারণ, হাতের আঙ্গুল দিয়ে এটা ব্যবহার করা হয় বলে এখানে রাজ্যের রোগজীবাণু জমা হতে পারে। শুকনো নরম সুতি কাপড় দিয়ে কিগুলো মুছে কটন বাড দিয়ে প্রত্যেকটা কী-এর চারপাশ পরিষ্কার করা যায়। তারপর উল্টো করে কয়েকবার হাল্কা ঝাঁকি দিলে কী-বোর্ডটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কাঠিতে তুলা লাগিয়ে বা কটন বাড দিয়ে পরিষ্কার করে নরম সুতি কাপড় দিয়ে কী-বোর্ড মুছে নিতে হয়

মাউস পরিষ্কার: আজকাল প্রায় সব মাউস অপটিক্যাল মাউস, আলো প্রতিফলিত হয়ে এটা কাজ করে তাই মাউসের লেন্স যদি অপরিষ্কার থাকে তাহলে মাউস ঠিক করে কাজ নাও করতে পারে। মাউসটিতে যদি সত্যি সত্যি ধুলোবালি ময়লা জমা হয়ে থাকে তাহলে কম্পিউটার থেকে খুলে নিয়ে সেটা উল্টো করে যেখানে যেখানে ময়লা জমেছে কটন বাড দিয়ে সেটা পরিষ্কার করে নরম সুতি কাপড় দিয়ে মুছে নাও।

মাউসে যেখানে ময়লা জমে কাঠিতে তুলা লাগিয়ে বা কটন বাড দিয়ে সেটা মুছে নিতে হয়

কাজ

১. ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ল্যাবের বা অন্য কম্পিউটারগুলো পরীক্ষা করে দেখবে তার মনিটর, কী-বোর্ড এবং মাউস পরিষ্কার করার প্রয়োজন আছে কি-না।

২. তারা পরীক্ষা করে দেখবে বাতাস ঢোকার এবং বের হওয়ার জায়গায় ধুলো জমে বন্ধ হয়ে গেছে কি-না।

নতুন শিখলাম: কটন বাড, এলসিডি মনিটর, পিক্সেল, শর্ট সার্কিট, তিনেগুর।

পাঠ ৩ : সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ

আমরা দেখেছি, একটা কম্পিউটারের দুটি অংশ থাকে– হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার। আগের পাঠ দুটিতে আমরা হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণের কথা বলেছি, কাজেই তোমরা প্রশ্ন করতে পারো তাহলে কি সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন নেই?

অবশ্যই আছে। যারা কম্পিউটার ব্যবহার করে তারা জানে যে, কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের যত্ন না নিলে যতটুকু যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় তার থেকে অনেক বেশি যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় কম্পিউটারের সফটওয়্যারের যত্ন নেওয়া না হলে।

এই যন্ত্রণাটুকুর কারণ হচ্ছে কম্পিউারের ভাইরাস। তোমরা নিশ্চয়ই রোগজীবাণু এবং ভাইরাসের কথা শুনেছ। এই রোগজীবাণু এবং ভাইরাসের কারণে আমরা মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ি– আমরা তখন ঠিক করে কাজ করতে পারি না। কম্পিউটার ভাইরাস ঠিক সেরকম এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম যার কারণে একটা কম্পিউটার ঠিক করে কাজ করতে পারে না। সত্যিকারের রোগজীবাণু বা ভাইরাস যেমন একজন মানুষ থেকে অন্য মানুষের কাছে গিয়ে তাকে আক্রান্ত করতে পারে। কম্পিউটার ভাইরাসও একটি কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ছড়িয়ে পড়তে পারে। সত্যিকারের ভাইরাস যে রকম মানুষের শরীরে এলে বংশবৃদ্ধি করে অসংখ্য ভাইরাসে পরিণত হয়, কম্পিউটার ভাইরাসও সেরকম। একটি কম্পিউটার ভাইরাস কোনোভাবে একটা কম্পিউটারে ঢুকতে পারলে অসংখ্য ভাইরাসে পরিণত হয়। সত্যিকারের ভাইরাস মানুষের অজান্তে মানুষকে আক্রান্ত করে, কম্পিউটার ভাইরাসও সবার অজান্তে একটা কম্পিউটারে বাসা বাঁধে!

সত্যিকারের ভাইরাস এবং কম্পিউটারের ভাইরাসের মাঝে শুধু একটি পার্থক্য, একটি প্রকৃতিতে আগে থেকে আছে, অন্যটি অসৎ মানুষেরা সবাইকে কষ্ট দেবার জন্যে তৈরি করছে!

কম্পিউটার ব্যবহারে নিয়ে সতর্ক না থাকলে কম্পিউটার ভাইরাস আমাদের অনেক যন্ত্রণার কারণ হতে পারে

মানুষের তৈরি কম্পিউটার ভাইরাস আসলে একটি ছোটো প্রোগ্রাম ছাড়া আর কিছুই নয়। আজকাল কম্পিউটার নেটওয়ার্ক দিয়েও এটি খুব সহজে অনেক কম্পিউটারের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে পারে। একটা কম্পিউটার থেকে তুমি যদি কোনো সিডি বা পেনড্রাইভে করে কিছু একটা কপি করে নাও তাহলে নিজের অজান্তে সেখান থেকে ভাইরাসটাও কপি করে ফেলতে পার। তাই অন্য কম্পিউটার থেকে কিছু কপি করতে হলে সব সময়ই খুব সতর্ক থাকা উচিত।

কম্পিউটার ভাইরাস কিন্তু রোগ জীবাণু ভাইরাসের মতো নয়, সেটা আমাদের অসুস্থ করতে পারে না! এই ভাইরাস পাশাপাশি এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে যেতে পারে না। এটি যেতে পারে শুধুমাত্র তথ্য উপাত্ত কপি করার সময় বা নেটওয়ার্ক দিয়ে।

কম্পিউটার ভাইরাস থেকে কম্পিউটারকে রক্ষা করার জন্যে আজকাল নানা ধরনের এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম পাওয়া যায়। তবে কিছু দুষ্টু প্রকৃতির মানুষ নিয়মিতভাবে নতুন নতুন ভাইরাস তৈরি করে সেগুলো ছড়িয়ে দেয়। তাই যারা কম্পিউটার ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচতে চায় তাদের নিয়মিত নতুন নতুন এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম কিনতে হয়। সেটি সাধারণ মানুষের জন্যে অনেক খরচের ব্যাপার।

তবে মুক্ত সফটওয়্যার বা ওপেন সোর্স সফটওয়্যারের জন্যে ভাইরাস তৈরি করা হয় না। কাজেই কেউ যদি মুক্ত সফটওয়্যারের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে, তাহলে তারা এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারে।

কম্পিউটারে কাজ করার জন্য চেয়ারে বসার সঠিক ভঙ্গি

কাজ

সত্যিকারের ভাইরাস আর কম্পিউটারের ভাইরাসের মাঝে কোথায় কোথায় মিল রয়েছে আর কোথায় কোথায় মিল নেই তার একটা তালিকা তৈরি কর।

নতুন শিখলাম : ভাইরাস, কম্পিউটার ভাইরাস, এন্টিভাইরাস।

পাঠ ৪ ও ৫: আইসিটি ব্যবহারে ঝুঁকি ও সতর্কতা অবলম্বনের পন্থা

দুধ খুব পুষ্টিকর খাবার। শিশুদের নিয়মিত দুধ খাওয়া ভালো। কিন্তু আমরা যদি একটা দুধের ড্রামে একটা শিশুকে ফেলে দিই তাহলে এই দুধের ড্রামেই তার ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। যার অর্থ একটা জিনিস খুব ভালো হলেও সেটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হলে সেটাও তোমার জন্যে বিপদ হয়ে যেতে পারে। কম্পিউটারের বেলাতেও সেটা সত্যি!

কম্পিউটার তৈরি করা হয়েছে আমাদের দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করার জন্যে, এটা সেভাবেই ব্যবহার করা উচিত কিন্তু আমরা যদি এটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে শুরু করি, তাহলে সেটা বিপদের কারণ হতে পারে।

কম্পিউটার ব্যবহার করতে একটু বুদ্ধিমত্তার দরকার হয়। তাই অনেক বাবা-মা তাদের খুব ছোটো বাচ্চাকে এটা নিয়ে খেলতে দেন। অনেক সময়েই দেখা যায়, কিছু ছোটো শিশু কম্পিউটার গেমে আসক্ত হয়ে গেছে এবং দিনরাত কম্পিউটার গেম খেলছে। এটা তার জন্য মোটেই কল্যাণকর নয়। যেই বয়সে মাঠে বন্ধুবান্ধবের সাথে ছোটাছুটি করে খেলার কথা, সেই সময়ে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কম্পিউটারের সামনে বসে থেকে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। শারীরিক অসুস্থতা থেকে মানসিক অসুস্থতা অনেক বেশি বিপজ্জনক।

সব বয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়মিতভাবে সাঁতার কেটে বা মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে খেলা উচিত

অনেক বেশি সময় কম্পিউটারের সামনে বসে থাকলে শারীরিক সমস্যাও শুরু হয়ে যেতে পারে। পিঠে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, আঙুলে ব্যথা, চোখের সমস্যা– এরকম হতে শুরু করলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই!

আরেকটু বড়ো তরুণ-তরুণীদের নিয়ে কম্পিউটারে ভিন্ন এক ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। একজন মানুষ অন্যজনের সাথে আজকাল কম্পিউটার ব্যবহার করে সামাজিকভাবে যোগাযোগ করতে পারে। সাধারণ খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে এটি সহজ একটা পথ হলেও প্রায় সময়ই দেখা যায় অনেকেই এটাকে বাড়াবাড়ি পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনেকেই মনে করে এটিই বুঝি সত্যিকারের সামাজিক সম্পর্ক। তাই মানুষের সাথে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্কটার কথা তারা ভুলে যায়। এই ছেলেমেয়েগুলো অনেক সময়েই অসামাজিক মানুষ হয়ে বড়ো হতে থাকে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তুলনামূলকভাবে অনেক নতুন প্রযুক্তি। তাই আমরা এখনো তার পুরো ক্ষমতাটা বুঝে উঠতে পারিনি। একদিকে আমরা তার ভালো কিছু করার ক্ষমতাটা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের নিজেদের অজান্তে এটা যেন আমাদের ক্ষতি করতে না পারে সেটাও দেখতে হবে।

তোমরা যারা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিজের জীবনে ব্যবহার করবে, তারা সব সময়ই মনে রেখো, তোমরা যেন প্রযুক্তিটাকে ব্যবহার কর, প্রযুক্তি যেন কখনই তোমাদের ব্যবহার করতে না পারে।

১৩০১

কাজ-(পাঠ-৪)

যাদের অনেক বেশি সময় ধরে কম্পিউটার ব্যবহার করতে হয় তাদের জন্যে ডাক্তারগণ এক ধরনের পিঠে ব্যায়াম বের করেছেন, তোমরা ইচ্ছে করলে এই ব্যায়ামটা করে দেখতে পার।

- সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অথবা বসে দুই বাহু সামনের দিকে প্রসারিত করে নিচে ও ওপরে কয়েকবার ঝাঁকাও।
- হাতের আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ কর এবং খুলে দাও। এভাবে ১০ বার অনুশীলন কর।
- এক হাতের আঙুলগুলোকে অপর হাতের আঙুলে প্রবেশ করে শক্ত করে ধরে কয়েকবার সামনে-পিছনে কর।
- সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় ডানদিকে কাত করে কয়েক সেকেন্ড রেখে সোজা হও। আবার বাম দিকে কাত করে কয়েক সেকেন্ড রেখে সোজা হও। এরূপ কয়েকবার অনুশীলন কর।
- ঘাড় সামনের দিকে ঝুঁকে চিবুক বুকের সাথে লাগাও এবং কয়েক সেকেন্ড অবস্থান করে পিছনের দিকে যতটুকু পার নিচু কর। এটি কয়েকবার অনুশীলন কর।

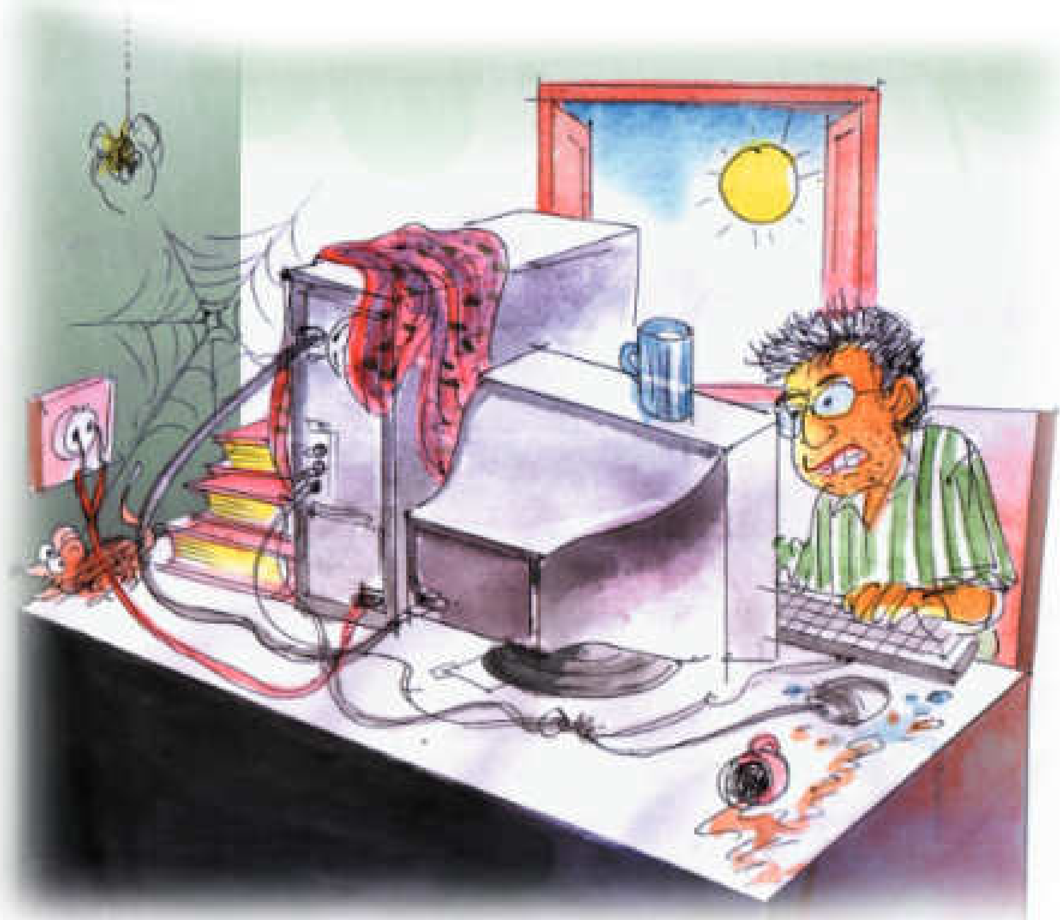

কাজ-(পাঠ-৫)

ওপরের ছবিটিতে আইসিটি ব্যবহারে কী কী ভুল করা হয়েছে বের কর।

- তোমরা নিজেরা আরও কিছু ভুল সংযোজন করে আরেকটা ছবি আঁক।
- একটি পূর্ণ শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা এ কাজটি করবে।

নতুন শিখলাম : সামাজিক নেটওয়ার্ক।

নমুনা প্রশ্ন

১. আমাদের দেশে বিদ্যুৎপ্রবাহের ভোল্টেজ কত?

ক. ২০০ খ. ২২০
গ. ২৪০ ঘ. ২৬০

২. কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবাইকে কোন বিষয়ে বেশি সতর্ক থাকা উচিত?

ক. সময়ের খ. বৈদ্যুতিক সংযোগ
গ. মানসিক ক্লান্তি ঘ. দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া

৩. সিআরটি মনিটর পরিষ্কার করার জন্য প্রথমে কী ব্যবহার করা উচিত?

ক. নরম সুতি কাপড় খ. মোটা সুতি কাপড়
গ. ভেজা সুতি কাপড় ঘ. গ্লাস ক্লিনার

৪. আইসিটি যন্ত্রপাতির নিরাপদ ব্যবহার বলতে বোঝায়–

i. আইসিটি যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ
ii. স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়িয়ে আইসিটির নিরাপদ ব্যবহার
iii. আইসিটি যন্ত্রপাতির ক্ষতির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
খ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. হার্ডওয়্যার পরিষ্কার করার সময় শুরুতে কোন কাজটি করতে হয়?

ক. কক্ষের বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা
খ. কম্পিউটারের বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা
গ. অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
ঘ. কম্পিউটার বন্ধ করে দেওয়া

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

ভুল করে জানালা খোলা রেখেই সালমা মা-বাবার সাথে কক্সবাজার বেড়াতে গিয়েছিল। বাসায় ফিরে এসে দেখে তার কম্পিউটারের কী-বোর্ড ও মাউস ঠিকমতো কাজ করছে না।

৬. সালমার কম্পিউটারের কী-বোর্ড ও মাউস ঠিকমতো কাজ না করার কারণ–

i. কক্ষটিতে অতিরিক্ত ধুলোবালির প্রবেশ
ii. কম্পিউটার কক্ষে এয়ারকন্ডিশনার ব্যবহার না করা
iii. কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণে অসতর্কতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭. সালমা তার মাউসটি পরিষ্কার করতে প্রথমে কী ব্যবহার করতে পারে?

ক. গ্লাস ক্লিনার খ. ভেজা নরম কাপড়
গ. সুতি কাপড় ঘ. কটন বাড

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়ার্ড প্রসেসিং

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- ওয়ার্ড প্রসেসিং বিষয়টি বর্ণনা করতে পারব;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কিছু একটা লিখে সেটা সংরক্ষণ করার জন্যে ফাইল তৈরি করতে পারব;
- ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করে ইংরেজিতে কাজ চালানোর মতো লেখার কাজ করতে পারব।

পাঠ ১ : ওয়ার্ড প্রসেসর কী?

তোমাদের পড়াশোনা করার জন্যে নিশ্চয়ই অনেক লেখালেখি করতে হয়। খাতার পৃষ্ঠায় কিংবা কাগজে তোমরা পেনসিল বা কলম দিয়ে সেগুলো লিখ। যার হাতের লেখা ভালো, সে একটু গুছিয়ে লিখতে পারে তার খাতটা দেখতে হয় সুন্দর। যার হাতের লেখা ভালো না, গুছিয়ে লিখতে পারে না, কাটাকাটি হয়, তারটা দেখতে তত সুন্দর হয় না।

কিন্তু মাঝেমধ্যে তোমাদের নিশ্চয়ই সুন্দর করে লেখার দরকার হয়, স্কুল ম্যাগাজিন বের করছ কিংবা কোনো অতিথিকে মানপত্র দিচ্ছ, কিংবা কোনো একটা জাতীয় প্রতিযোগিতায় রচনা জমা দিচ্ছ—তখন তোমরা কী করবে? এক সময় কিছু করার ছিল না– বড়োজোর কষ্ট করে টাইপরাইটারে লিখতে হতো। এখন কিন্তু কম্পিউটার ব্যবহার করে লিখে প্রিন্টারের মাধ্যমে খুব সুন্দর করে ছাপিয়ে নেওয়া যায়। লেখালেখির জন্যে যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি হয়েছে তার নাম হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসর। লেখালেখি করতে হলেই শব্দ বা ওয়ার্ড লিখতে হয়, সুন্দর করে লিখতে হলে শব্দগুলোকে সাজাতে হয় গোছাতে হয়– আর এটা হচ্ছে এক ধরণের প্রক্রিয়া- যার ইংরেজি হচ্ছে প্রসেসিং (processing)। দুটি মিলে হয় ওয়ার্ড প্রসেসিং, আর যে সফটওয়্যার ওয়ার্ড প্রসেসিং করে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসর।

ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করে কী কী করা যায়, সেটা তোমরা নিজেরাই পরের পাঠে বের করে ফেলতে পারবে। তোমরা যখন সত্যিকারের কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করে কিছু একটা লিখবে তখন আরও খুঁটিনাটি বিষয় জেনে যাবে, যেগুলো বই পড়ে বুঝা সহজ হয় না। তারপরও ওয়ার্ড প্রসেসর নিয়ে দু-একটি কথা না বললেই নয়। প্রথমত, সাধারণ লেখালেখি বা টাইপরাইটারের সাথে ওয়ার্ড প্রসেসরের সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসরে এডিটিং বা পরিবর্তন করা যায়। টাইপরাইটারে কিছু একটা লেখার পর আমরা যদি দেখি কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে তখন মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। ভুলটা শুদ্ধ করতে হলে আবার পুরোটা গোড়া থেকে টাইপ করতে হয়। ওয়ার্ড প্রসেসরে ভুল শুদ্ধ করার মতো সহজ কাজ আর কিছুই হতে পারে না। শুধু ভুল নয় ইচ্ছে করলেই যেকোনো পরিবর্তন করা যেতে পারে, পুরাতন অংশ বাদ দিয়ে দেওয়া যায়, নতুন অংশ যোগ দেওয়া যায়।

লেখালেখির সাথে ওয়ার্ড প্রসেসরের দ্বিতীয় বড়ো পার্থক্যটি হচ্ছে সংরক্ষণ। হাতে লেখা কাগজ সংরক্ষণ করা খুব সহজ নয়। কোথায় রাখা হয়েছে মনে থাকে না। দরকারের সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। খুঁজে পাওয়া গেলেও হয়তো দেখা যায় উইপোকা খেয়ে ফেলেছে। ওয়ার্ড প্রসেসরে এগুলোর কোনো ভয় নেই। লেখালেখি করে একটা ফাইল হিসেবে হার্ডড্রাইভে রেখে দেওয়া যায়। দরকার হলে একটা পেনড্রাইভে বা সিডিতে কপি করে রাখা যায়। আরও বেশি সাবধান হলে অন্য কোনো কম্পিউটারেও কপি সংরক্ষণ করা যায়।

যেহেতু ওয়ার্ড প্রসেসর সবার জন্যে প্রয়োজনীয় আর খুব জনপ্রিয় সফটওয়্যার তাই সফটওয়্যারের সব বড়ো কোম্পানিই চমৎকার সব ওয়ার্ড প্রসেসর তৈরি করছে। যেমন, মাইক্রোসফট কোম্পানির মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সেরকম একটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। কেউ যদি টাকা না দিয়ে বিনামূল্যে ওয়ার্ড প্রসেসর সংগ্রহ করতে চায় তাহলে তার জন্যেও সফটওয়্যার আছে আর সেটি হলো ওপেন অফিস রাইটার।

কাজেই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, কাগজ আবিষ্কার করে একদিন মানুষের সভ্যতার একটা নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিল। হাজার বছর পর আজ কাগজ ছাড়াও লেখা সম্ভব এবং সেটা দিয়ে সভ্যতার আরেকটা নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড প্রসেসর

এক নজরে ওয়ার্ড প্রসেসরের কাজ

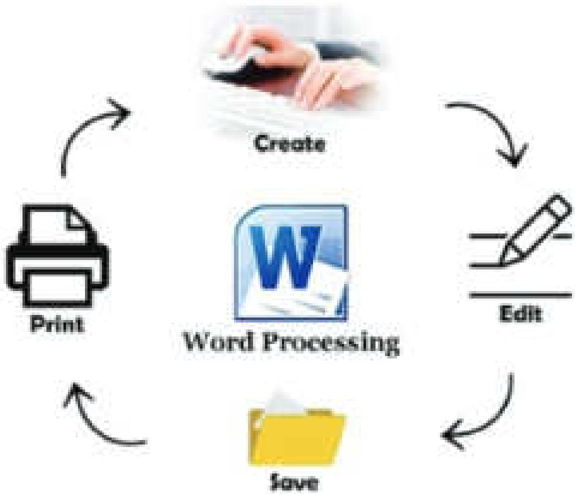

কাজ

ক্লাসের শিক্ষার্থীদের নিয়ে দুটি দল তৈরি কর। একদল যুক্তি দাও–ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করে কাগজের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করে দিলে কী লাভ? অন্য দল যুক্তি দাও–কেন এখনও কাগজের ব্যবহার রাখতে হবে? কাদের যুক্তি ভালো সেটা লক্ষ কর।

নতুন শিখলাম : ওয়ার্ড প্রসেসিং, ওয়ার্ড প্রসেসর, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, ওপেন অফিস রাইটার, ফাইল।

পাঠ ২: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ওয়ার্ড প্রসেসরের গুরুত্ব

কথায় বলে একটা ছবি একশ কথার সমান। এই পাঠে আমরা সেই কথাটি সত্যি না মিথ্যা সেটা দেখার চেষ্টা করব। ওয়ার্ড প্রসেসর দিয়ে কী কী করা যায়? কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ? সেসব কিছু না বলে তোমাদের দুটি ছবি দেখানো হচ্ছে। একটা ছবিতে আছে হাতে লেখা একটি পৃষ্ঠা। সেই একই পৃষ্ঠাটি ওয়ার্ড প্রসেসরে টাইপ করে তোমাদের দেখানো হলো। তোমরা দুটি পৃষ্ঠাই ভালো করে লক্ষ করে নিজেরাই আবিষ্কার কর ওয়ার্ড প্রসেসর দিয়ে কী কী করা যায়।

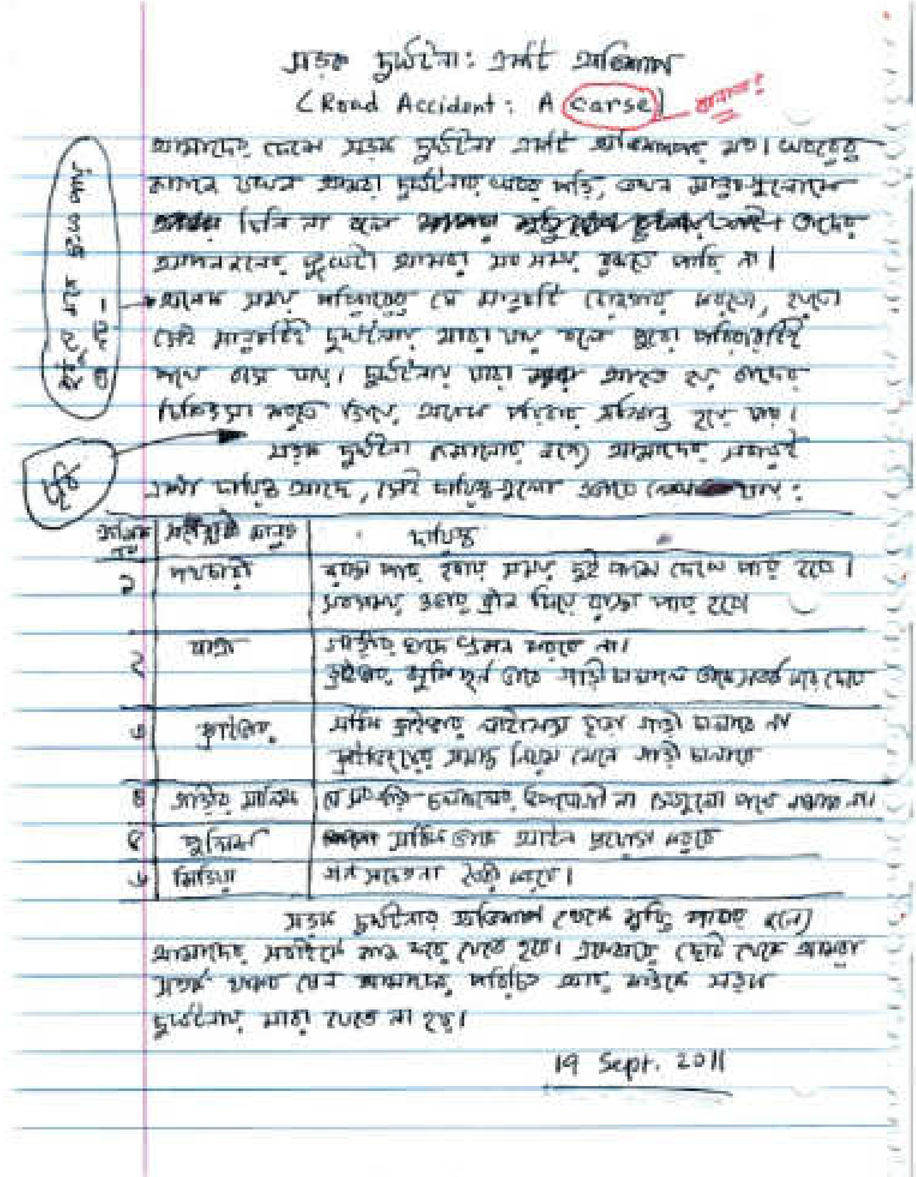

হাতে লেখা রূপ

ওয়ার্ড প্রসেসরে লেখাটির নতুন রূপ

সড়ক দুর্ঘটনা: একটি অভিশাপ

(Road Accident: A Curse)

আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনা একটি অভিশাপের মতো। খবরের কাগজে যখন আমরা দুর্ঘটনার খবর পড়ি, তখন মানুষগুলোকে চিনি না বলে তাদের আপনজনের দুঃখটা আমরা সব সময় বুঝতে পারি না। শুধু যে মনে দুঃখ পায় তা নয়, অনেক সময় পরিবারের যে মানুষটি রোজগার করত, হয়তো সেই মানুষটি দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে পুরো পরিবারটিই পথে বসে যায়। দুর্ঘটনায় যারা আহত হয় তাদের চিকিৎসা করতে গিয়ে অনেক পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

সড়ক দুর্ঘটনা কমানোর জন্যে আমাদের সবারই একটা দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্বগুলো এভাবে লেখা যায়:

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট মানুষ	দায়িত্ব
১	পথচারী	রাস্তা পার হওয়ার সময় দুই পাশে দেখে পার হবে। সবসময় ওভারব্রিজ দিয়ে রাস্তা পার হবে।
২	যাত্রী	গাড়ির ছাদে ভ্রমণ করবে না। ড্রাইভার ঝুঁকিপূর্ণভাবে গাড়ি চালালে তাকে সতর্ক করে দেবে।
৩	ড্রাইভার	সঠিক ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালাবে না। ড্রাইভিংয়ের সমস্ত নিয়ম মেনে গাড়ি চালাবে।
৪	গাড়ির মালিক	যেসব গাড়ি চলাচলের উপযোগী নয়, সেগুলো পথে নামাবে না।
৫	পুলিশ	সঠিকভাবে আইন প্রয়োগ করবে।
৬	মিডিয়া	গণসচেতনতা তৈরি করবে।

সড়ক দুর্ঘটনার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আমাদের সবাইকে কাজ করে যেতে হবে। একেবারে ছোট থেকে আমরা সতর্ক থাকব, যেন আমাদের পরিচিত আর কাউকে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যেতে না হয়।

19 September 2011

পাঠ ৩ থেকে ২৮: ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করে নতুন ফাইল খোলা ও লেখা

এতদিন আমরা কেবল বইয়ে কম্পিউটারের কিংবা আইসিটির নানারকম বর্ণনা পড়েছি। এবারে আমাদের সময় এসেছে সত্যিকারের কম্পিউটারে হাত দিয়ে সত্যিকারের কাজ করার। প্রথমে আমরা ব্যবহার করব ওয়ার্ড প্রসেসর।

তোমাদের স্কুলের ল্যাবের কম্পিউটারে কোন অপারেটিং সিস্টেম আছে, সেখানে কোন ওয়ার্ড প্রসেসর আছে তা বলা সম্ভব নয়। তাই তোমাদের নির্দিষ্ট ওয়ার্ড প্রসেসরের ব্যবহার শেখানো যাবে না। কিন্তু তাতে কোনো সমস্যা নেই দুটি কারণে। প্রথম কারণ, সব ওয়ার্ড প্রসেসরই মোটামুটি একই রকম। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে, দেখা গেছে তোমাদের বয়সী শিক্ষার্থীদের কম্পিউটারের ব্যবহার সম্পর্কে একটা সহজাত দক্ষতা আছে। বড়োরা যেগুলো করতে পারে না কিংবা বুঝতে পারে না, তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়েরা সেগুলো চট করে ধরে ফেলে। তাহলে শুরু করা যাক:

প্রথমে কম্পিউটারের পাওয়ার অন করতে হবে। যদি ঠিকমতো বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া থাকে, তাহলে পাওয়ার অন করার পর অপারেটিং সিস্টেম তার কাজ শুরু করে দেবে। সবকিছু পরীক্ষা করে যখন দেখবে সবকিছু ঠিকঠাক আছে এবং কম্পিউটার ব্যবহার করার মতো অবস্থায় আছে, তাহলে মনিটরে অনেকগুলো আইকন ফুটে উঠবে—আইকন অর্থ ছোটো একটা ছবি। কোনো একটা লেখা পড়ে বোঝার চেয়ে ছবি বোঝা সহজ। সেজন্যে লেখার সাথে আইকনের ছবিটা থাকে।

তুমি যদি এখন মাউসটা নাড়াও তাহলে দেখবে মনিটরে একটা চিহ্ন নড়ছে। যারা আগে কখনো মাউস ব্যবহার করেনি তাদের বিষয়টি শিখতে হয়। মাউসটা কোনদিকে নাড়ালে মনিটরের চিহ্নটি কোনদিকে নড়ে সেটা শিখে যাওয়ার পর চিহ্নটিকে বা পয়েন্টারটিকে তুমি ওয়ার্ড প্রসেসরের ওপর এনে বসাও। কোনটি ওয়ার্ড প্রসেসরের আইকন সেটি তুমি যদি না জানো তাহলে তোমার শিক্ষককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে। পয়েন্টারটা যদি ঠিকঠাকভাবে ওয়ার্ড প্রসেসরের আইকনের ওপর বসে তাহলে সেটার চিহ্ন একটু অন্যরকম হয়ে যাবে।

এবার মাউসের বাম দিকের বাটনটি দুইবার ক্লিক করতে হবে। যারা নতুন তাদের প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হতে পারে। কিন্তু তাতে সমস্যা নেই। মাউসটিকে না নড়িয়ে ঠিকঠিকভাবে দুইবার ক্লিক করতে পারলেই ওয়ার্ড প্রসেসরটি চালু হয়ে যাবে, কম্পিউটারের ভাষায় 'ওপেন' হয়ে যাবে।

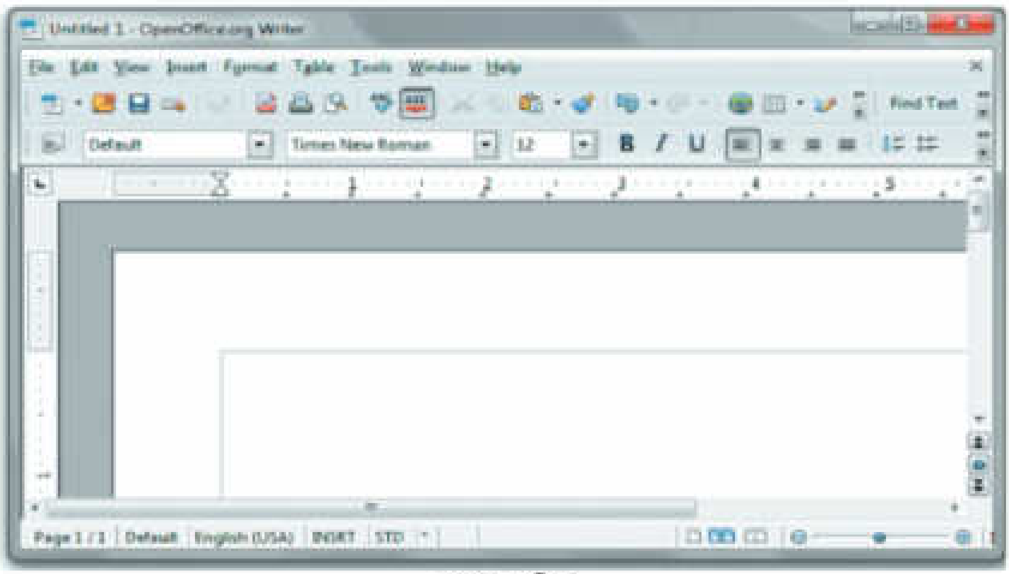

ওপেন অফিস

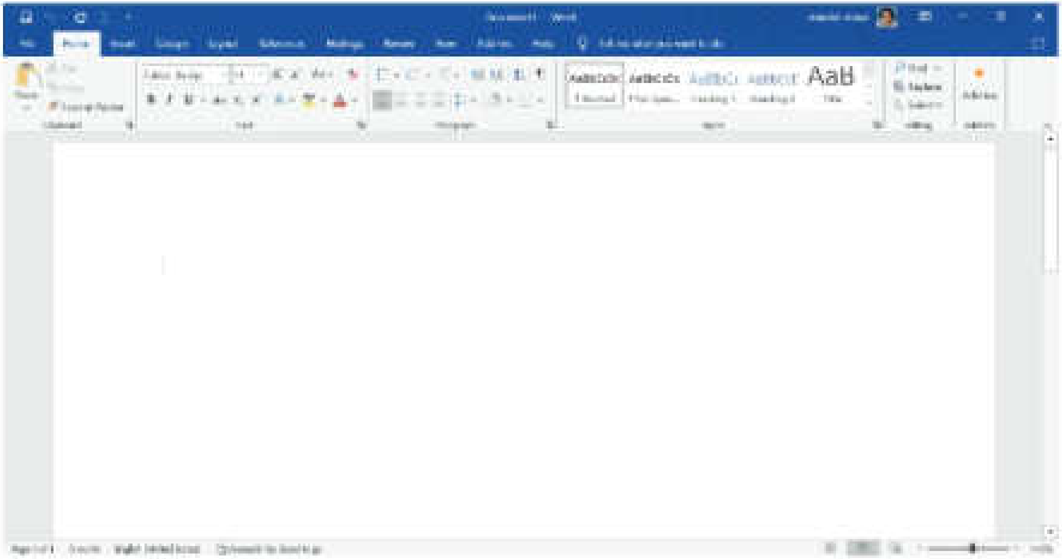

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আর ওপেন অফিস রাইটার দুটি একেবারে ভিন্ন ওয়ার্ড প্রসেসর হলেও দেখতে প্রায় একই।

তোমরা যে ওয়ার্ড প্রসেসরই ব্যবহার কর না কেন, দেখবে পুরো মনিটর জুড়ে একটা সাদা কাগজের মতো পৃষ্ঠা খুলে যাবে এবং তার শুরুতে একটা ছোটো খাড়া লাইন জ্বলতে-নিভতে থাকবে, যা Cursor নামে পরিচিত যার অর্থ তোমার ওয়ার্ড প্রসেসর লেখালেখি করার জন্যে প্রস্তুত। তুমি লেখালেখি শুরু করে দাও।

যদি তুমি কী-বোর্ডের কোথায় কী আছে সেটা না জান তাহলে সত্যিকারের কিছু লিখতে একটু সময় লাগবে। কিন্তু এখনই সত্যিকারের অর্থবোধক কিছু লিখতেই হবে, কে বলেছে? কী-বোর্ডের বোতামগুলো টেপাটেপি কর দেখবে সাদা স্ক্রিনে লেখা বের হতে শুরু করেছে। কোথায় টেপা হলে কী লেখা হয় একটু লক্ষ করতে পার। তবে কয়েকটা বিষয় জানা থাকলে সুবিধা হয়। সেগুলো হচ্ছে :

ক. Shift Key চেপে ধরে লিখলে বড়ো হাতের অক্ষরে লেখা হবে, না হয় ছোটো হাতে।

খ. একটা শব্দ লেখা শেষ হওয়ার পর Space Bar টিপ দিলে একটা খালি Space লেখা হবে।

গ. একটা পুরো প্যারাগ্রাফ লেখা শেষ হলে Enter বাটন চাপ দিলে নতুন প্যারাগ্রাফ লেখা শুরু হবে।

ঘ. যখন লেখা হয় তখন Cursor টি লেখার শেষে থাকে– মাউস নড়িয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে গেলে Cursor টিও সেখানে যায়, মাউসটিতে ক্লিক করা হলে সেখান থেকে লেখা শুরু হবে।

ঙ. Delete বোতামটি চাপ দিলে Cursor-এর পরের অংশ মোছা যাবে। Backspace বোতামে চাপ দিলে Cursor-এর আগের অংশ মোছা যাবে।

(কী-বোর্ডের Control, Alt বা Function কী গুলো দিয়ে আরও অনেক কিছু করা যায়, তবে আপাতত সেগুলোতে চাপ না দেওয়াই ভালো।)

ওপরের পাঁচটি বিষয় জানা থাকলেই ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করে সবকিছু লিখে ফেলা সম্ভব। তুমি যদি অর্থবোধক (কিংবা অর্থবিহীন!) কিছু লিখে থাক, তাহলে তুমি ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহারে দ্বিতীয় ধাপে যেতে পার। সেটি হচ্ছে যেটুকু লিখেছ সেটা সংরক্ষণ করা, কম্পিউটারের ভাষায় Save করা।

প্রায় সব ওয়ার্ড প্রসেসরেই লেখালেখি সংরক্ষণ করার নিয়ম একই রকম। তোমরা যদি ওয়ার্ড প্রসেসরের ওপরের দিকে তাকাও তাহলে একটি রিবন দেখতে পাবে রিবনের বাম পাশে File মেনুতে ক্লিক করলে একটা মেনু খুলে যাবে। সেখানে অনেক কিছু লেখা থাকতে পারে। সেখান থেকে Save শব্দটি খুঁজে বের করে ক্লিক কর, তাহলে তুমি যেটা লিখেছ ওয়ার্ড প্রসেসর সেটা সংরক্ষণ বা কম্পিউটারের ভাষায় Save করতে শুরু করে দেবে। তুমি যেটা লিখেছ যখন সেটাকে Save করবে তখন সেটাকে বলা হবে একটা File। প্রত্যেকটা File কে একটা নাম দিয়ে Save করা হয়। তুমি যখন প্রথমবার এটা Save করছ তখনো সেটার নাম দেওয়া হয়নি তাই ওয়ার্ড প্রসেসর তোমাকে একটা নাম দেওয়ার কথা বলবে, তখন তোমাকে টাইপ করে নাম লিখে দিতে হবে। যদি তোমার স্কুলের ল্যাবের কম্পিউটারগুলো অনেকেই ব্যবহার করে তাহলে তোমার ফাইলটাকে আলাদা করে চেনার জন্যে প্রথমবার তোমার নিজের নামটাই লিখতে পার। ফাইলটা Save করার পর এটা কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক ড্রাইভে সংরক্ষিত হয়ে যাবে।

এবার তুমি তোমার ওয়ার্ড প্রসেসরটি বন্ধ করে দাও। অনেকগুলো নিয়ম আছে, আপাতত আবার File মেনুতে ক্লিক করে সেখান থেকে Exit option বেছে নাও। মাউসের কার্সর সেখানে নিয়ে ক্লিক করলেই ওয়ার্ড প্রসেসর বন্ধ হয়ে যাবে।

তোমাকে অভিনন্দন! তুমি কম্পিউটারের ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করে প্রথম একটি ফাইল তৈরি করেছ।

এবার আমরা তৃতীয় ধাপে যেতে পারি। যে ফাইলটা তৈরি করে তোমার নাম দিয়ে Save করা হয়েছে, এখন সেটা আবার খুলে তার মাঝে আরও কিছু কাজ করা যাক। অনেকভাবে করা যায়, আপাতত আমরা আমাদের পরিচিত পদ্ধতিটাই ব্যবহার করি।

আগের মতো আবার ওয়ার্ড প্রসেসরের আইকন ডাবল ক্লিক করি। ওয়ার্ড প্রসেসর আগের মতো নতুন একটা File খুলে দেবে, কিন্তু আমরা সেখানে কিছু লিখব না। আমরা আবার ফাইল মেনু (File menu) বাটনে ক্লিক করব। ক্লিক করলে যে মেনু আসবে তা হতে Open সাব মেনুতে ক্লিক করব। ক্লিক করলে যে ফাইল তৈরি হয়েছে তার নামগুলো (বা আইকনগুলো) দেখাবে। তুমি তোমার নাম লেখা ফাইলটি খুঁজি বের কর, সেখানে দুইবার ক্লিক কর, দেখবে ফাইলটি খুলে গেছে। তুমি শেষবার যে যে কাজ সংরক্ষণ করেছ তার সবগুলো সেখানে লেখা আছে– কিছুই মুছে যায় নি বা হারিয়ে যায়নি।

তুমি এই ফাইলটাতে আরও কিছু লেখালেখি কর। যখন লেখালেখি শেষ হবে তখন ফাইলটা আবার Save করে রেখে দাও।

আর একবার অভিনন্দন। তুমি ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করার একেবারে প্রাথমিক বিষয়টা শিখে গেছ। এখন তোমার শুধু প্র্যাকটিস করতে হবে। তার সাথে মেনুগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পার আর কী কী করা যায়।

কাজ

১. একটা ফাইল খুলে সেখানে "The quick brown fox jumps over a lazy dog" এই বাক্যটা লিখ। এই বাক্যে বৈশিষ্ট্যটা কী বলতে পারবে?

২. ওপরের বাক্যটা বারবার লিখতে থাক। দেখা যাক কত তাড়াতাড়ি কতবার লিখতে পার। নিজেদের ভেতর একটা প্রতিযোগিতা শুরু করে দাও, দেখ কে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি লিখতে পারে।

ওপরের বাক্যটাতে ইংরেজিতে প্রত্যেকটা অক্ষর আছে তাই কেউ যদি এটা লিখতে পারে তার মানে সে ইংরেজির প্রত্যেকটা অক্ষর লিখতে পারে।

নতুন শিখলাম : মেনু, Option, Cursor, File, Save, আইকন।

নমুনা প্রশ্ন

১. কোন সফটওয়্যারের মাধ্যমে কম্পিউটারে লেখালেখির কাজ করা যায়?

ক. গ্রাফিক্স সফটওয়্যার

খ. ইউটিলিটি সফটওয়্যার

গ. ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার

ঘ. স্প্রেডশিট সফটওয়্যার

২. ওয়ার্ড প্রসেসরে 'এন্টার' (Enter) কোন কাজে ব্যবহার করা হয়?

ক. নির্বাচিত অংশ মুছে ফেলতে

খ. কার্সরকে এক লাইন নিচে নামাতে

গ. কার্সরের বাম দিকের অক্ষর মুছতে

ঘ. মেনু বা ডায়লগ বক্স বাতিল করতে

৩. রিবন কী?

ক. ডকুমেন্টের শিরোনাম নির্দেশনা

খ. চিত্রের মাধ্যমে সাজানো কমান্ড তালিকা

গ. কাজের ধরন অনুযায়ী কমান্ড তালিকা

ঘ. চিত্রের সাজানো সম্পাদনার কমান্ড তালিকা

৪. File বাটন ব্যবহার করে পুরাতন ফাইল খুলতে কোথায় ক্লিক করতে হয়?

ক. New

খ. Open

গ. Save

ঘ. Text

৫. File বাটন ব্যবহার করে লিখিত অংশ সংরক্ষণ করতে কোথায় ক্লিক করতে হয়?

ক. New

খ. Close

গ. Save

ঘ. File

৬. File বাটন ব্যবহার করে ফাইল বন্ধ করতে কোথায় ক্লিক করতে হয়?

ক. Exit

খ. Save

গ. File

ঘ. Open

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

মিনা জানলেন, পৃথিবীর পাঁচটি দেশে নারীদের অবস্থা বেশি শোচনীয়। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, এ বিষয়ে গবেষণা করে প্রাপ্ত ফলাফল সেমিনারে উপস্থাপন করবেন। এছাড়াও তিনি খ্যাতিমান ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময়ের চিন্তা করলেন।

৭. সেমিনারে উপস্থাপনের জন্য মিনা কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রতিবেদন তৈরি করবেন?

ক. গ্রাফিক্স সফটওয়্যার

খ. ইউটিলিটি সফটওয়্যার

গ. ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার

ঘ. কাস্টমাইজড সফটওয়্যার

৮. মিনা খ্যাতিমান ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে কোন মাধ্যমটি বেশি উপযোগী বলে বিবেচনা করতে পারেন?

ক. মোবাইল ফোন

খ. ল্যান্ডফোন

গ. ইন্টারনেট

ঘ. ফ্যাক্স

৯. ৮ নম্বর প্রশ্নের যে উত্তরটি তুমি পছন্দ করেছ সে উত্তরটি পছন্দ করার কারণ যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

....

....

....

পঞ্চম অধ্যায়

ইন্টারনেট পরিচিতি

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- ইন্টারনেট সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- ওয়েবসাইট সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- ব্রাউজার ব্যবহার করে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারব;
- সার্চ ইঞ্জিন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে ইন্টারনেট থেকে তথ্য খুঁজে বের করতে পারব ।

পাঠ ১: ইন্টারনেট

এই বইয়ে আমরা অনেকবার বলেছি যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিয়ে সারা পৃথিবীতে একটা বিপ্লব হচ্ছে এবং আমরা সবাই আমাদের চোখের সামনে সেই বিপ্লবটা ঘটতে দেখছি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটির এই বিপ্লবটুকু যে বিষয়গুলোর জন্যে ঘটছে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে ইন্টারনেট। কাজেই তোমাদের সবাইকে ইন্টারনেট সম্পর্কে জানতে হবে। সবাইকে কখনো না কখনো ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হবে! বিষয়টি বোঝার জন্যে নিচের কয়েকটি ঘটনার কথা কল্পনা করা যাক:

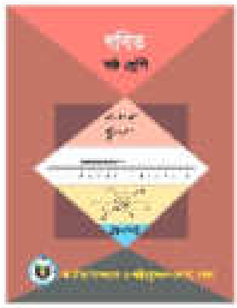

ইন্টারনেট থেকে পাঠ্যপুস্তক ডাউনলোড করা যায়

ঘটনা ১: একদিন রাহাত স্কুল থেকে বাসায় আসছে। হঠাৎ করে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি শুরু হলো। রাহাত মহা খুশি, এ দেশের বৃষ্টির মতো এত সুন্দর বৃষ্টি আর কোথায় আছে? রাহাতের বৃষ্টিতে ভিজতে খুব ভালো লাগে। তাই সে ভিজতে ভিজতে বাসায় এলো। কিন্তু বাসায় এসে হঠাৎ তার মনে পড়ল সে তো স্কুলের ব্যাগ নিয়ে বাসায় এসেছে। সেই ব্যাগ নিশ্চয়ই ভিজে একাকার। দেখা গেল সত্যি তাই। তার আম্মু তাকে একটু বকা দিয়ে বইগুলো ফ্যানের নিচে শুকাতে দিলেন। কিন্তু দেখা গেল গণিত বইটা ভিজে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। রাহাতের এত মন খারাপ হলো যে সে কেঁদেই ফেলল। তার আম্মু বললেন, "ঠিক আছে আর কাঁদতে হবে না। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর ওয়েবসাইট (www.nctb.gov.bd) থেকে তোমার গণিত বই ডাউনলোড করে প্রিন্ট করিয়ে বাঁধাই করিয়ে দেবো। নতুন একটা বই পেয়ে যাবে!" সত্যি সত্যি আম্মু সেটা করে দিলেন। রাহাত এক ঘন্টার মধ্যে নতুন একটা বই পেয়ে গেল।

ঘটনা২: দুই বন্ধুকে জরুরি কাজে একটা জায়গায় যেতে হবে। মুশকিল হলো সেখানে তাদের পরিচিত কেউ আগে যায়নি, সেখানে যাওয়ার রাস্তা আছে কি না সেটাও জানা নেই। হঠাৎ তাদের মনে পড়ল ইন্টারনেটে গিয়ে সেই জায়গাটার ম্যাপটা তারা দেখতে পারে! কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা জায়গাটার খুঁটিনাটি সব কিছু দেখতে পেল, একটা বিলের পাশ দিয়ে ছোটো একটা রাস্তা ধরে তারা যেতে পারবে। দুজন পরদিন সেখানে পৌঁছে গেল।

ইন্টারনেটে জাতীয় স্মৃতিসৌধের নিখুঁত ম্যাপ দেখা যায় (গুগল আর্থ-এর সৌজন্যে)

ঘটনা ৩: ট্রেনে একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা তার দুই মেয়ে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন। তার সামনের সিটে বসেছে একজন বিদেশি। যেতে যেতে দুজন কথা বলছে। কথা প্রসঙ্গে বিদেশি মানুষটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা জানতে পারল। সে বলল, "তোমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটি আমার জানার খুব ইচ্ছা, কোনো বই কি পাওয়া যাবে?" যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বললেন, "অবশ্যই! আমি ইন্টারনেটের একটা লিংক দিই। সেখানে তুমি সব পেয়ে যাবে।"

বিদেশি মানুষটি লিংক নিয়ে তখনই তার ল্যাপটপে বসে গেল, দুই মিনিটের মধ্যে সে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস পড়তে শুরু করল।

ঘটনা ৪: স্কুলে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মিলি "আমি টাকডুম টাকডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল" গানটির সাথে নাচবে। কিন্তু মুশকিল হলো তাদের বাসায় এই গানের ক্যাসেট বা সিডি কিছুই নেই। মিলির খুব মন খারাপ। সে আশা প্রায় ছেড়েই দিচ্ছিল। তখন তার স্কুলের শিক্ষিকা রওশন আরা বললেন, "মিলি, তোমার কোনো চিন্তা নেই। আমি ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে গানটা বের করে এমপিথ্রি (MP3) কপি ডাউনলোড করে নেব!" সত্যি তাই হলো, শিক্ষিকা গানটি ডাউনলোড করে নিলেন, তারপর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মিলি সেটার সাথে নেচে সবাইকে মুগ্ধ করে দিল।

ঘটনা ৫: যাঁরা ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্যে এই বইটি লিখছেন হঠাৎ করে তাঁদের খেয়াল হলো, এই বইয়ে সুপার কম্পিউটারের কথা বলা হয়েছে কিন্তু সেখানে তো কোনো ছবি নেই। এই বয়সী শিক্ষার্থীদের বইয়ে যদি সুন্দর সুন্দর ছবি না থাকে তাহলে কি তারা বইটি পড়তে আগ্রহী হবে? যাঁরা লিখছেন তাঁরা অবশ্য ছবিটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করলেন না। কারণ, তারা জানেন উইকিপিডিয়া (wikipedia.org) নামে যে বিশাল বিশ্বকোষ আছে, সেখানে একটা না একটা ছবি পেয়েই যাবেন! আসলেও পেয়ে গেলেন– তোমরা নিজেরাই সেটা দেখেছ।

ঘটনা ৬, ঘটনা ৭, ঘটনা ৮... এভাবে আমরা চোখ বন্ধ করে কয়েক হাজার ঘটনার কথা বলতে পারি। তোমরাই বলো, তার কি দরকার আছে? তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছ ইন্টারনেট হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে পৃথিবীর যাবতীয় তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাবছ কোন মানুষটি এত তথ্য এক জায়গায় একত্র করেছে? কেমন করে করেছে? পৃথিবীর যেকোনো মানুষ কেমন করে এই তথ্য ব্যবহার করতে পারে?

উত্তরটা খুব সহজ। ইন্টারনেট একজন মানুষের একটা কম্পিউটার দিয়ে তৈরি হয়নি। ইন্টারনেট হচ্ছে সারা পৃথিবীর লক্ষ কোটি কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক। যারা এই ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হয়েছে তারা ইচ্ছে করলে এই লক্ষ কোটি কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, যেকোনো কম্পিউটার থেকে তথ্য পড়তে বা প্রয়োজনে সংরক্ষণ করতে পারে। লক্ষ কোটি কম্পিউটারের সবগুলোতে যদি একটু করেও তথ্য থাকে, তাহলে কত বিশাল তথ্য ভাণ্ডার হয়ে যাবে চিন্তা করতে পারবে?

কাজ

পুরো শ্রেণি কয়েকটা দলে ভাগ করে নাও। শিক্ষার ব্যাপারে ইন্টারনেট কীভাবে কাজে লাগানো যায়, একটি দল তার একটি তালিকা তৈরি কর। অন্য একটি দল স্বাস্থ্যের ব্যাপারে-ইন্টারনেট কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তার একটি তালিকা কর। আরেক দল কর খেলাধুলার ব্যাপারে কিংবা বিনোদনের ব্যাপার-তারপর সবগুলো তালিকা একত্র করে দেখ কত বড়ো তালিকা হয়েছে!

নতুন শিখলাম : ওয়েবসাইট, ডাউনলোড, এমপি থ্রি।

পাঠ ২–৩ : ইন্টারনেট সংযোগ ও নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক খেলা

এর আগের পাঠে ইন্টারনেট দিয়ে কী করা যায়, আমরা সেটা দেখেছি। তোমাদের নিশ্চয়ই জানার কৌতূহল হচ্ছে এটা কেমন করে কাজ করে!

আমরা আগেই বলেছি ইন্টারনেট হচ্ছে পৃথিবীজোড়া কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক। নেটওয়ার্ক বলতে আমরা কী বোঝাই বলে দেওয়া দরকার। তোমাদের স্কুলের কম্পিউটার ল্যাবে যদি অনেকগুলো কম্পিউটার থাকে আর সবগুলো কম্পিউটার যদি "সুইচ" নামের একটা যন্ত্র দিয়ে সংযোগ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে একটা কম্পিউটার অন্য একটা কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে, আর আমরা বলব তোমাদের স্কুলের কম্পিউটারগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্কিং করা আছে। অর্থাৎ তোমাদের স্কুলে একটা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আছে।

ধরা যাক, তোমাদের স্কুলের পাশে আরেকটা স্কুল আছে, তারা তোমাদের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক দেখে অবাক হয়ে গেল। তখন তারাও তাদের শিক্ষকদের কাছে কম্পিউটারের একটা নেটওয়ার্কের জন্যে আবদার করল। তাদের শিক্ষকরাও তখন তাদের স্কুলে অনেকগুলো কম্পিউটার দিয়ে একটা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক করে দিলেন। এখন সেই স্কুলের ছেলেমেয়েরাও তাদের একটা কম্পিউটার থেকে আরেকটা কম্পিউটারে সংযোগ করতে পারে।

কয়েক দিন পর তোমরা নিশ্চয়ই টের পাবে যে, তোমরা তোমাদের স্কুলের কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সব কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে পার; কিন্তু পাশের স্কুলের কোনো কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে পার না! তোমাদের নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে সেটা করতে ইচ্ছে করে। যদি সেটা করতে হয় তাহলে

দুটি নেটওয়ার্ক একসাথে জুড়ে নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে

তোমাদের স্কুলের নেটওয়ার্ক পাশের স্কুলের নেটওয়ার্কের সাথে জুড়ে দিতে হবে। সেটা জুড়ে দেওয়ার জন্য যেই যন্ত্রটা ব্যবহার করা হবে তার নাম রাউটার। ছবিতে তোমাদের স্কুলের নেটওয়ার্ক কীভাবে পাশের স্কুলের নেটওয়ার্কের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে সেটা এঁকে দেখানো হয়েছে।

তোমাদের স্কুলের নেটওয়ার্কের সাথে তোমাদের পাশের স্কুলের নেটওয়ার্ক জুড়ে দেওয়া হলো, যদি তার সাথে তোমাদের এলাকার কলেজের নেটওয়ার্ক, তার সাথে একটা মেডিকেল কলেজের নেটওয়ার্ক জুড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তৈরি হবে নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক। আর সেটাই ইন্টারনেটের জন্ম রহস্য। ইন্টারনেট শব্দটা এসেছে Interconnected Network কথাটা থেকে। প্রথম শব্দ Interconnected এর Inter দ্বিতীয় শব্দ Network এর Net মিলে তৈরি হয়েছে Internet ! ১৯৬৯ সালের প্রথম ইন্টারনেটে ছিল মাত্র চারটি কম্পিউটার–এখন রয়েছে কোটি কোটি কম্পিউটার!!

> **কাজ (পাঠ–২)**
> তোমার বইয়ের ছবিতে দুটি নেটওয়ার্ক জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মনে কর আরও দুটি নেটওয়ার্ক আছে তুমি সেগুলো ছবি এঁকে জুড়ে দাও।

এবার আমরা নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক খেলব (পাঠ-৩):

ক্লাসের ছেলেমেয়েরা ভাগাভাগি করে নেটওয়ার্ক হয়ে যাও।

এই খেলাটি খেলার জন্য একজন হবে রাউটার।
কয়েকজন হবে সুইচ, অন্য সবাই কম্পিউটার।

প্রত্যেকটা কম্পিউটারের একটা করে নম্বর দেওয়া হবে।
সুইচগুলোর নাম হবে লাল, নীল, সবুজ এরকম।

লাল সুইচের সাথে কয়েকজন কম্পিউটার মিলে হবে লাল নেটওয়ার্ক।
সেরকম নীল সুইচের সাথে কয়েকজন কম্পিউটার মিলে নীল নেটওয়ার্ক, সবুজের সাথে মিলে হবে সবুজ নেটওয়ার্ক।

এক সুইচ অন্য সুইচের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবে না, যদি করতে হয় সেটা করবে রাউটারের মাধ্যমে।

এখন কম্পিউটাররা অন্য কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ শুরু কর।

যে কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে চাও একটা কাগজে সেটা লিখ (যেমন, সবুজ ১৩, কিংবা লাল ৭), কাগজটা তোমার নেটওয়ার্কের সুইচকে দাও।

সুইচ যদি দেখে সেটা নিজের নেটওয়ার্কের তাহলে সাথে সাথে তাকে দিয়ে দেবে।
যদি দেখে সেটা অন্য নেটওয়ার্কের তাহলে কাগজটা দেবে রাউটারকে।

রাউটার সেটা দেবে সেই নেটওয়ার্কের সুইচকে।

সুইচ দেবে তার কম্পিউটারকে।

তোমরা কত দ্রুত এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে পার, পরীক্ষা করে দেখ!

নতুন শিখলাম : নেটওয়ার্ক, সুইচ, রাউটার।

পাঠ ৪: ওয়েবসাইট

আমরা দেখেছি ইন্টারনেট হচ্ছে নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক। আর এভাবে অসংখ্য কম্পিউটার একটা আরেকটার সাথে যোগাযোগ করতে পারে। যখন কম্পিউটারের সাথে কম্পিউটারের যোগাযোগ হয়ে যায় তখন সবাই নানাভাবে সেই সুযোগটা গ্রহণ করতে চায়। সবচেয়ে সহজ সুযোগ হচ্ছে নিজের তথ্য অন্যের সামনে তুলে ধরা। আর সেটা করার জন্য যে ব্যবস্থাটা দেওয়া হয়, তাকে বলে ওয়েবসাইট। কেউ যদি কারও কাছ থেকে তথ্য নিতে চায়, তাহলে তার ওয়েবসাইটে যেতে হয়। সেখানে সব তথ্য সাজানো থাকে।

যেরকম একটা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বিভাগগুলোর নাম লিখে দেয়, ভর্তি হতে হলে কী করতে হয় লিখে দেয়, শিক্ষকদের নাম, তারা কী নিয়ে গবেষণা করেন সেগুলোও লিখে দেয়।

যারা ওয়েবসাইট তৈরি করে তারা চেষ্টা করে যেন প্রয়োজনীয় সব তথ্য খুব সুন্দরভাবে সাজানো থাকে। সেখান থেকে তথ্য যেন সহজে নেওয়া যায়। তোমরা ইচ্ছে করলে খবরের কাগজের ওয়েবসাইটে গিয়ে খবর পড়তে পারবে, সংগীতের ওয়েবসাইটে গিয়ে গান শুনতে পারবে, ছবির ওয়েবসাইটে গিয়ে ছবি দেখতে পারবে।

যারা ব্যবসা করে তারা তাদের পণ্যগুলোর তথ্য ওয়েবসাইটে দিয়ে দেয়। প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রতিষ্ঠানের খবর দেয়। আজকাল ওয়েবসাইট থেকে জিনিসপত্র কেনাবেচা করা যায়। প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের একটা সহজ নাম থাকে, তোমরা সেই নাম দিয়ে ওয়েবসাইটকে খুঁজে বের করতে পারবে। ওয়েবসাইটকে যেন সহজে খুঁজে বের করা যায়, সেজন্যেও ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তোমার জন্যে সেই কাজ করে দেবে। তার নাম হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন। আমরা পরের পাঠে সেটা সম্পর্কে আরও ভালো করে জানব।

বাংলাদেশের জাতীয় ওয়েব পোর্টাল

বিবিসি (www.bbc.com)

বিডি-জবস্ (www.bdjobs.com)

মুক্তপাঠ (muktopaath.gov.bd)

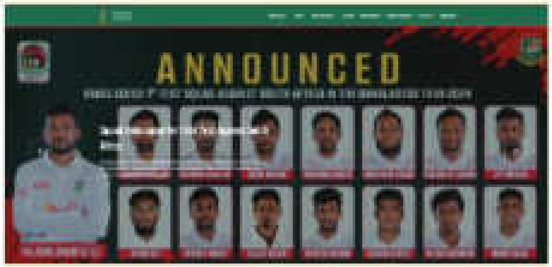

বিসিবি (www.tigercricket.com.bd)

শিক্ষক বাতায়ন (www.teachers.gov.bd)

নাসা (www.nasa.gov)

কাজ

মনে কর, তোমরা তোমাদের স্কুলের একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে চাও। তাহলে সেখানে কী কী তথ্য রাখতে চাও? চার-পাঁচজনের দলে ভাগ হয়ে একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নতুন শিখলাম: URL, ওয়েবসাইট।

পাঠ ৫ – ২০: ওয়েব ব্রাউজার ও সার্চ ইঞ্জিন

ওয়েব ব্রাউজার: ইন্টারনেটে ওয়েবসাইট দেখার জন্যে দুটো জিনিসের দরকার: (১) তোমার কম্পিউটারের সাথে ইন্টারনেটের সংযোগ (২) ওয়েব খুঁজে বের করে তার থেকে তথ্য আনতে পারে, সে রকম একটি বিশেষ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার।

ইন্টারনেটকে অনেকটা কাল্পনিক জগতের মতো মনে কর, ওয়েবসাইটগুলো যেন সেই কাল্পনিক জগতের তথ্যভান্ডারের ঠিকানা! কেউ যদি ওয়েবসাইটগুলো দেখে তাহলে তার মনে হবে, সেটা যেন কাল্পনিক জগতে ঘুরে বেড়ানোর মতো। ইংরেজিতে যেটাকে বলে ব্রাউজিং। তাই ওয়েবসাইট দেখার জন্য যে বিশেষ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে, সেটার নাম দেওয়া হয়েছে ব্রাউজার।

এই মুহূর্তে যে ব্রাউজারগুলো বেশি ব্যবহৃত হয় সে গুলো হচ্ছে- মজিলা ফায়ারফক্স, গুগল ক্রোম, অপেরা, মাইক্রোসফট এজ, সাফারি ইত্যাদি।

জনপ্রিয় ব্রাউজারের আইকনগুলো

ওয়েবসাইটে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে বা কম্পিউটারের ভাষায় ওয়েব ব্রাউজ করার জন্যে একটা ব্রাউজার ব্যবহার করার কাজটি অসম্ভব সোজা। তোমাকে কেবল ব্রাউজার আইকনটিকে দুবার ক্লিক করে ওপেন করতে হবে। সেখানে আগে থেকে কোনো ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেওয়া থাকলে সেই ওয়েবসাইটটি শুরুতে আপনাআপনি খুলে যাবে। এখন তুমি যে ওয়েবসাইটে যেতে চাও সেটা নির্দিষ্ট জায়গায় লিখতে হবে। প্রত্যেকটা ব্রাউজারের ওয়েবসাইটের ঠিকানা লেখার জন্য ওপরে একটা জায়গা আলাদা করা থাকে (সেটাকে বলে এড্রেস বার)। সেখানে লেখা শেষ হলে Enter বাটন চাপ দিতে হবে—আর কিছুই না! তোমার ইন্টারনেট সংযোগ কত ভালো তার ওপর নির্ভর করে কত তাড়াতাড়ি ওয়েবসাইট তোমার চোখের সামনে খুলে যাবে।

তুমি যদি প্রথমবার একটা ব্রাউজার ব্যবহার কর তখন তুমি হয়ত ওয়েবসাইটের ঠিকানা জান না বলে কোথাও যেতে পারবে না। তাই তোমাকে কয়েকটা ওয়েবসাইটের ঠিকানা দিয়ে দেওয়া হলো, তুমি সেগুলো টাইপ করে দেখ:

বাংলাদেশ জাতীয় ওয়েব পোর্টাল: www.bangladesh.gov.bd

বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য: www.parjatan.gov.bd

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখার জন্য: www.liberationwarmuseum.org

নাসার ওয়েবসাইট দেখার জন্য: www.nasa.gov

উপগ্রহ থেকে কোন এলাকা কেমন দেখায় তা জানার জন্য: maps.google.com

তবে মনে রেখো, এই ওয়েবসাইটগুলোর ঠিকানা টাইপ করলে তুমি ওয়েবসাইটে হাজির হবে। কিন্তু ওয়েবসাইটে তথ্যগুলো কিন্তু নানা স্তরে সাজানো থাকে—তোমাকে সেগুলো খুঁজে নিতে হবে!

কাজ
ওয়েবসাইট থেকে বাংলাদেশের দশটি দর্শনীয় স্থানের নাম খুঁজে বের কর, নাসার ওয়েবসাইট থেকে সাতটি গ্রহের ছবি খুঁজে বের কর। তোমার উপজেলা/থানার ম্যাপটি খুঁজে বের কর।

ইন্টারনেটে যেহেতু অসংখ্য ওয়েবসাইট আছে এবং হতে পারে কিছু কিছু ওয়েবসাইট তোমার খুব প্রিয় হয়ে যাবে। তুমি হয়ত মাঝে মাঝেই সেই ওয়েবসাইটে যেতে চাইবে–প্রত্যেকবারই যেন ওয়েবসাইটের ঠিকানা লিখতে না হয় সেজন্যে প্রিয় ওয়েবসাইটের ঠিকানা ব্রাউজারকে শিখিয়ে দেওয়া যায়। ব্রাউজার সেগুলো মনে রাখবে এবং তুমি চাইলেই তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবে।

সার্চ ইঞ্জিন: তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ইন্টারনেট একটা বিশাল ব্যাপার, সেখানে আছে লক্ষ লক্ষ কম্পিউটার এবং হাজার হাজার ওয়েবসাইট। সব ওয়েবসাইট যে ভালো তা নয়। অনেক ওয়েবসাইট তৈরি হয়েছে অবহেলায়, অনেক ওয়েবসাইট হয়তো তৈরি হয়েছে খারাপ উদ্দেশ্যে। যেহেতু ইন্টারনেটের কোনো মালিক নেই, এটি চলছে নিজের মতো করে। তাই তুমি যদি ইন্টারনেটে নিজে নিজে তথ্য খুঁজতে যাও তুমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে যাবে। মনে হবে তুমি বুঝি গোলক ধাঁধার মাঝে আটকে গেছ! তাই যখন কোনো তথ্য খোঁজার দরকার হয় তখন আমাদের বিশেষ এক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের সাহায্য নিতে হয়। এই সফটওয়্যারগুলোর নাম সার্চ ইঞ্জিন। এগুলো তোমার হয়ে তোমার যেটা দরকার সেটা খুঁজে দেবে। এই মুহূর্তে পৃথিবীর জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিনগুলো হচ্ছে:

গুগল	www.google.com
ইয়াহু	www.yahoo.com
বিং	www.bing.com

এগুলো ব্যবহার করাও খুব সোজা। প্রথমে ব্রাউজারটি ওপেন করে সেটার এড্রেসবারে যে সার্চ ইঞ্জিনটি ব্যবহার করতে চাও তার ঠিকানাটি লিখ। তারপর এন্টার চাপ দাও, সাথে সাথে সার্চ ইঞ্জিন চলে আসবে। সব সার্চ ইঞ্জিনেই তুমি যেটা খুঁজতে চাইছ সেটা লেখার জন্যে একটা জায়গা থাকে। তোমার সেখানে কাঙ্ক্ষিত বিষয়বস্তুর নামটি লিখতে হবে। তারপর এন্টার চাপ দিলেই যে যে ওয়েবসাইটে তোমার কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি থাকতে পারে তার একটা বিশাল তালিকা চলে আসবে। এখন তুমি তালিকার একটি একটি ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখ আসলেই তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি পাও কি না। যদি না পাও, তাহলে আরেকটা ওয়েবসাইটে খুঁজে দেখ!

Google সার্চ ইঞ্জিনের শুরু পৃষ্ঠা

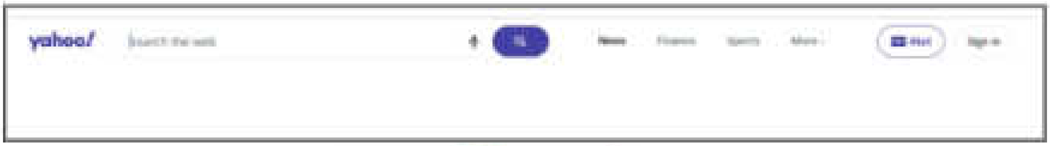

Yahoo সার্চ ইঞ্জিনের শুরু পৃষ্ঠা

Bing সার্চ ইঞ্জিনের শুরু পৃষ্ঠা

কাজ

ইন্টারনেট গবেষণা করার জন্যে খুব চমৎকার জায়গা। ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তিনজন তিনজন করে দলে ভাগ হয়ে যাও। প্রত্যেকটি দল নিচের বিষয়গুলোর যেকোনো একটি বেছে নাও :

- Planets
- Liberation War of Bangladesh
- T-Rex
- Spiders
- Snakes
- Cricket
- Football
- Blackhole
- Tiger

কোনো একটি সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের তালিকা বের করে তোমার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো লেখ। সেটার ওপর ভিত্তি করে একটা প্রতিবেদন লিখ।

প্রতিবেদনে নিচের বিষয়গুলো থাকবে :

- প্রতিবেদনের শিরোনাম
- তোমার নাম, শ্রেণি, রোল নম্বর, স্কুলের নাম
- ভূমিকা
- তোমার গবেষণার ফলাফল (ছবি সংযুক্ত করতে পার)
- উপসংহার
- কোন কোন ওয়েবসাইট থেকে তথ্য পেয়েছ তার তালিকা

নতুন শিখলাম : ব্রাউজার- মজিলা ফায়ারফক্স, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, গুগল ক্রোম, অপেরা, সাফারি, সার্চ ইঞ্জিন- গুগল, ইয়াহু, বিং।

নমুনা প্রশ্ন

১. পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত এক বিশাল নেটওয়ার্ক এর নাম–

ক. মোবাইল নেটওয়ার্ক

খ. ল্যান্ডফোন নেটওয়ার্ক

গ. ইন্টারনেট

ঘ. হাইপারলিংক

২. ইন্টারনেট কত সালে শুরু হয়?

ক. ১৯৫৯

খ. ১৯৬৯

গ. ১৯৭৯

ঘ. ১৯৮৯

৩. ইন্টারনেট থেকে নির্দিষ্ট তথ্য খুঁজে বের করতে কী ব্যবহার করতে হয়?

ক. ওয়েব ব্রাউজার

খ. সার্চ ইঞ্জিন

গ. হাইপারলিংক

ঘ. ই-মেইল

৪. তথ্যের মহাসরণি কাকে বলা হয়?

ক. ই-মেইল

খ. মোবাইল ফোন

গ. ইন্টারনেট

ঘ. ল্যান্ডফোন

৫. ইন্টারনেটকে Interconnected Network বলার কারণ হচ্ছে–

i. এটি বিশ্বব্যাপী অসংখ্য কম্পিউটারের সাথে যুক্ত

ii. এর মাধ্যমে বিশ্বের অসংখ্য ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ সম্ভব

iii. এর মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. i ও ii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত শিক্ষার্থী দীপা দীর্ঘদিন পর মা-বাবার সাথে বাংলাদেশে আসে। আসার আগে তার শিক্ষক তাকে 'বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থান' সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লিখে পাঠাতে বলেন।

৬. দীপা বাসায় বসে দ্রুত ও সহজে বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে কীভাবে তথ্য পেতে পারে?

ক. খবরের কাগজ পড়ে

খ. বাংলাদেশ বিষয়ক বইপত্র পড়ে

গ. মোবাইল ফোনের মাধ্যমে

ঘ. ইন্টারনেটের মাধ্যমে

৭. দীপা তার শিক্ষকের কাছে কোন মাধ্যম ব্যবহার করে প্রতিবেদনটি পাঠাতে পারে?

ক. ডাকযোগে

খ. ফ্যাক্সের মাধ্যমে

গ. ই-মেইলের মাধ্যমে

ঘ. মোবাইল ফোনে

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ষষ্ঠ–তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সব সমস্যার প্রতিকার হচ্ছে ধৈর্য।

– হোয়াটলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।